শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Presented by :—

Sri Nripendra Narayan Chowdhury and Gitasree Veda Bala Devi Chowdhurani of Bilasipara— Founders, Visuddhananda Spiritual Culture Centre—on the 73rd birth anniversary of Sri Aurobindo, the greatest living Seer of modern times, in humble appreciation of the light he has kindled to show the path to humanity individually and collectively, to blossom forth into divinity.

P. K BANERJEE,
Secretary.

দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স
২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

মূল্য ১৷৷৹

প্রকাশক : শ্রীতারাপদ পাত্র, দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স, ২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা।

মুদ্রাকর : শ্রীকামাখ্যাচরণ সেনগুপ্ত, বিচিত্রা প্রেস, ৬৫বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

ভূমিকা

গোড়ায়ই ব'লে রাখি, শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে কোনো 'প্রশস্তি' লিখতে যাওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। এ-বইটির নিবন্ধ ক'টিতে আমি চেয়েছি শুধু তাঁকে আমার অন্তরের সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে যে শ্রদ্ধার সরিক মানুষ চায় পাঁচজনের মধ্যে। অবশ্য আরও একটি কথা ব্যক্তিগত ভাবে জানাতে চেয়েছি: যে, শ্রীঅরবিন্দকে ঋষি ব'লে অঙ্গীকার করাটা শিষ্যের গুরুভক্তি জাতীয় উচ্ছ্বাস নয়—এ-প্রত্যয়ের স্বপক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কেবল মনে রাখতে হবে যে, এ সম্পর্কেও যুক্তিগুলি ঠিক প্রমাণ-জাতীয় বস্তু নয়: টেনিসনের কথা মনে পড়ে—"For nothing worthy proving can be proven"—তবে শ্রীঅরবিন্দের মতন যুগর্ষির সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু জনসাধারণের মনে একটু ঔৎসুক্য জাগাতে চাই একথা সানন্দেই স্বীকার করি। আর সেই সূত্রে জানাতে চাই—তেমনিই আনন্দে—যে, বাইরে থেকে দেখলে যদিও মনে হওয়া অযৌক্তিক নয় যে, শ্রীঅরবিন্দ সেই সনাতনপন্থী নির্জন-বিলাসী বিশ্ববিমুখ তপস্বীরই একটি আধুনিক সংস্কৃত সংস্করণ,—কিন্তু, তাঁর মনস্বিতা ও তপঃশক্তির সঙ্গে যাঁরাই সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের অনেককেই ক্রমশ মানতে দেখেছি যে যাকে হাল আমলে বলা হয় escapism (পলায়নী বৃত্তি) শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় ভাবে দর্শনে কাব্যে কর্মপ্রচেষ্টায় কোথাও তার ছোঁয়াচ লাগে নি। এ বিষয়ে তাঁর দর্শনলব্ধ জীবনমন্ত্র কবি নিশিকান্ত তাঁর একটি অপরূপ গানে প্রকাশ করেছেন:

পালাবি কোনখানে তুই ?
বাঁধনের জাল যে পাতা !
তারে না ছিঁড়িস যদি
মিছে তোর সাধন সাধা।
(ও আমার বৈরাগী মন, ওরে ভীরু !)

যারে তুই বলিস মায়া
সে যে তোর আপন কায়া।
যেখানে যাবি রে তুই
সে রবে শিরায় গাঁথা।
(ওরে তোর আপন সুতার জাল যে গাঁথা !)

যারে তুই স্বপন বলিস
তারে ভয় পাস কেন বল্ ?
সে যে তোর আপন স্বপন
তারে তুই কর্ না সফল।
(ও আমার বৈরাগী মন, ওরে ভীরু !)

কী অতল সুপ্তি হ'তে
আপনার স্বপন স্রোতে
স্বপনী দেয় ভাসিয়ে
জীবনের হাসা কাঁদা !
(ওরে তোর আপন সুতার জাল যে গাঁথা !)

ভূমিকা

জীবনের জাগরণে
সে-বিশাল সুপ্তিরে আন্।
স্বপনের সুরে বাজা
স্বপনীর মর্মেরি গান।
(ও আমার বৈরাগী মন, ওরে ভীরু !)

সুখের আর দুখের মাঝে
যে-গভীর রহস রাজে
জনমে আর মরণে
সে-অমর আছে বাঁধা।
(ওরে তোর আপন সুতার জাল যে গাঁথা !)

তারে তুই তোল্ বিকশি'
সব সুখ-দুখের পারে।
সে যে তোর স্বরূপ অসি
ভুলেছিস কেন তারে ?
(ও আমার বৈরাগী মন, ওরে ভীরু !)

কেটে ফেল্ আপন ধারে
আপনার বাঁধনটারে
দূরে তুই পালাস কেন ?
ভেঙে ফেল্ ভয়ের বাধা।
(ওরে তোর আপন সুতার জাল যে গাঁথা)

একথা শ্রীঅরবিন্দ নানা সুরেই বলেছেন, তাঁর Future Poetry-র নানান্ গম্ভীর ভবিষ্যদ্বাণীতে: যে, ভাবিযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপজীব্য হবে অধ্যাত্ম সত্য ও উপলব্ধি। একটি পত্রে তাই তিনি লিখেছিলেন, "My aim in writing or in encouraging others to write is not personal glory but to arrive at the expression of spiritual truth and experience of all kinds in poetry." অর্থাৎ, "আমি কবিতা লিখি ও অপরকে লিখতে উৎসাহিত করি কোনো ব্যক্তিগত গরিমার লোভে নয়, কাব্যে আমি চাই সর্ববিধ আত্মিক সত্য ও উপলব্ধির প্রকাশ।" কথাটা অবান্তর নয়। এ সূত্রে আমি জোর দিতে চাচ্ছি এই সত্যটির উপরে যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ চায় প্রকাশ—manifestation—সে বিতৃষ্ণাবাদী বা নেপথ্যপন্থী আদৌ নয়—যদিও এই অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি শোনা যায় আজকের দিনে। কিন্তু একদিন সবাই বুঝবেই বুঝবে যে, তিনি কী বস্তু—যেদিন তিনি আরো প্রকাশ হবেন তাঁর বিকাশের মধ্যাহ্ন লগ্নে। এখন তো তাঁর তপঃসিদ্ধির সবে উদয়লগ্ন।

শেষে এ-বইটির নিবন্ধ কয়টির সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি: "ঋষি" নিবন্ধটি আমার একটি অভিভাষণ—কলিকাতায় "নবীন-সংঘ"-অনুষ্ঠিত শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসবে ও খুলনার "ধর্ম সভায়" এই বৎসর পঠিত হয়েছিল। "জ্ঞানী" নিবন্ধটির প্রথমার্ধ "ভারতবর্ষে" বেরিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধ পরে লেখা। "প্রেমী" লেখা হয়েছিল বছর দুই আগে, এরও শেষার্ধ পুনর্লিখিত। "যোগী"—অধ্যাপক

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীহরিদাস চৌধুরীর "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা" নামে বইটিকে প্রসঙ্গ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের "যোগ" সম্বন্ধে সাধ্যমত দু-একটি কথা বলার চেষ্টা। "কবি শ্রীঅরবিন্দ" নামে একটি বই পরে লিখার ইচ্ছা রইল। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে এত কথা বলবার আছে যে একটি প্রবন্ধে স্থান সংকুলান হয় না।

এ বইটি প্রকাশের জন্যে ও নানারূপ উৎসাহ সহায়তার জন্যে আমি বন্ধুবর শ্রীশিশির কুমার মিত্র, শ্রীতারাপদ পাত্র, শ্রীবিশ্বনাথ নাগ শ্রীরামেশ্বর দে-র কাছে ঋণী। এঁরা উদ্যোগী না হ'লে বইটি বেরুতে অযথা বিলম্ব হ'ত।

তর্পণ

এনেছ আকাশ-আলো তারাহারা চিত্তকুঞ্জে তুমি।
তোমারি বসন্তবরে পুষ্পসিন্ধু মোর বন্ধ্যা ভূমি।
জীবনে জানি না যারে—চেতনায় তুমি তার বাণী
শিছালে তোমার শান্ত কণ্ঠরাগে। তুমি দিলে আনি,
দুর্লভ নির্ভর-দীক্ষা বিদ্রোহ-উদ্ধত সুপ্রখর
মনের উষর-চূড়ে। জানিত না কভু যে নির্ঝর,
নম্রকান্তি স্নিগ্ধ প্রেম তুমি তারে শিখালে তোমার
নীলিমা-আনত স্নেহনেত্র-করুণায়। বন্দনার
মন্দাকিনী নামালে—কঙ্কর যেথা ছিল ছত্রপতি।
তাই তো উচ্ছ্রিত অভিমান মোর মানিল প্রণতি
রাতুল চরণে তব।
দিনে দিনে তিলে তিলে তুমি
আঁধার-বন্দিনী বনস্থলী মোর তুলিলে কুসুমি'
মলয়-দাক্ষিণ্যে তব। আবর্জনা করিলে নিয়োগ
স্বরশস্য-উদ্বোধনে। সহযোগে ভুলালে বিয়োগ।
আশীর্বাদী প্রস্রবণে অনুর্বর বালুকাবিলাসী
গীতিহারা প্রাণে মোর বাজালে তোমার প্রীতি-বাঁশি।
অকিঞ্চনে কাঞ্চনের কৃতার্থ উজ্জ্বল উপহার
দিলে কত হে পরশমণীশ্বর! তোমার ঝঙ্কার
কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাই ধীরে···অতি ধীরে···মর্মমূলে

ঐশ্বর্যের আলোবাণী দিল আনি' তপস্যা বিপুলে।
অচিহ্নিত পথে ঋষি, চরণ তোমার অগ্রগামী
অভিযানে পথ কেটে চলিল অশঙ্কে দিনযামী
অন্তহীন ব্যাকুলতা-আলোকের পরম প্রয়োগে।
তাই তো সন্ধ্যার কূলে মিলিল তোমার মন্ত্রযোগে
নব অরুণিমা-ভাতি—অস্ত-সাগরের পারে যার
অম্বর-ওঙ্কার-ছটা আনিল অলক্ষ্য অঙ্গীকার।
ছন্দহারা পেল ছন্দ। তৃষাতুর অধর মানিল
তৃষার ইঙ্গিতপথে জ্বলে দিশা। অন্তর জানিল
অজানার লীলাভঙ্গি। মিলনের মোহানার ডাক
শুনিতে শিখিল ধীরে। ধূসরে বর্ণের অনুরাগ
জ্বালিয়া রঞ্জিত রঙে তুমি দিব্যদ্যুতি নিরঞ্জন,
অন্ধ চক্ষে গাঢ় স্নেহে প্রলেপিলে তোমারি অঞ্জন
সুদূর-চাহনি-ভরা।
বৃথা কলরব-সুখোৎসবে
কাটিত অলীক সমারোহে মোর দিন অগৌরবে।
মানব-জনম লভি' ছিলাম ভুলি' যে, দেবতার
শরণে নবীন দেবজন্ম-লাভ বিনা নাহি আর
লক্ষ্য এ-জীবনে। বৃথা যশ-মান-ধন-অহংকার
যদি চিরন্তন পানে নাহি ধায় স্বপ্ন-অভিসার।
অন্তরে প্রতীতি ছিল অমুকুলি'—জাদুকর, তারে
তুমি বনস্পতি-রূপ দিলে তব আশিস-ঝঙ্কারে

শাখানেত্রে ফুলমণি উদ্দীপিয়া মাধুরী-প্রদীপ
জ্বালায়ে আমার অনীশ্বর বনে হে আলো-অধিপ !
তারি অগ্রদৌত্যে মোর অন্ধকারে কিরণ-কাঁপন
প্রথম উঠিল জেগে নাশি' যুগান্তরের বাঁধন
রূপের কৃপাণ-বরে। খুলিল অযুত বাতায়ন
গগন-বঞ্চিত দেবালয়ে মোর, তাই নারায়ণ
জেনেছি তোমারে গুরু ! "বন্ধু" বলি' দুঃসাহসে তাই
তোমারে বন্দিয়া তব গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা চাই !
তোমার মূরতি-মাঝে চাহে তাই নয়নের তৃষা
হেরিতে অমূর্ত সুধাসুন্দর সঙ্গীরে—চিরদিশা
লাবণ্য-লীলায় যার আপনারি তমিস্রার মাঝে
দেখি অন্তহীন রবিচ্ছবি—যার বহ্নিমন্ত্র বাজে
অঙ্গারের অন্তঃপুরে,—কণ্টকের অন্তরালে যার
অদৃশ্য আনন্দকর পুষ্পলিপি লেখে অনিবার,—
অন্তরের বৃন্দাবনে রজ হয় যার পদধূলি
মন্থর বিষণ্ণ আশা অশ্রুধন্য হ'য়ে ওঠে দুলি'।
তোমারে বরিলে তাই জানি নিষ্ঠা হবে অচঞ্চল,
অরবিন্দ-বাণীবরে স্বপ্নবৃন্তে ফুটিবে কমল।

উৎসর্গ

শ্রীযুগল কিশোর বিরলা

বন্ধুবরেষু !

কিরণ যাহার নিত্য রবির দাক্ষিণ্য সম আনে
আকাশের আশীর্বাদ তাপহীন দীপ্তির বিধানে ;
ছায়া যার সুখস্নিগ্ধ আশ্রয়ের সম নেমে আসে :
মালিন্য বিলুপ্ত যেথা—শুধু শুভশান্তি পরকাশে ;
বরাভয় যার জ্বালে ধ্রুবতারা—নির্দিশা তুফানে,
অনাত্মীয় নক্ষত্রেও চিরাত্মীয় সম কাছে টানে ;
অধরা-অশোকগীতি গায় দুঃখ-দারুণ দুর্যোগে
মণিসম আভাময় আঁখিমণি উজলি' বিয়োগে ;
দুশ্চর তপস্যা যার নীলাম্বরে গণি' প্রিয়তম
ডেকে আনে ক্লান্ত বুকে সান্ত্বনা-সুগন্ধি মন্ত্রসম ;
অবনীর অভিমানী রাজরাজ হ'তে পরাধীন
নিঃস্ব ভিখারির তরে জাগে যে অতন্দ্র নিশিদিন ;
বরদ জলদ সম সাগরে গোষ্পদে ভালোবেসে
নিরপেক্ষ করুণার ধারা বরষায় নির্বিশেষে ;
তৃতীয় নয়ন যার 'জীবে নিত্য দেখে সদাশিব,'
'দেহে দেখে দেবালয়,' স্ফুলিঙ্গের বুকে চিরদীপ ;
জপিয়া জীবনোত্তমে জ্যোতির্মন্ত্রে যার প্রাণশিখা
ঝলকে জীবন-পঙ্কে অরবিন্দ-সুষমা-দীপিকা :—

তাহারি তর্পণে আমি গেঁথেছি যে ছোট মালাখানি
তব করে সঁপি প্রার্থি : "তুমিও, সুহৃদ্, তারে জানি
যেন সেই অজানারে জানো—যাঁরে বিনা সব জানা
ব্যর্থ হয় যাত্রা সম—নাহি যার তীর্থের ঠিকানা ;
যাঁর হেমপ্রভা বিনা নিভে যায় প্রেম-নীহারিকা,
হয় স্মৃত্রসার, ম্লান—আনন্দের মন্দার-মালিকা।
স্বভাব-বদান্য তুমি, তাই তব তরে এই চাই :
দানের নিকষে তব দানেশ্বরে চিনি' যেন ভাই
সকল দানের শ্রেষ্ঠ যে-প্রণাম সেই আত্মদানে
তাঁহারে জানিতে পারো—বিন্দু যথা নীলসিন্ধু জানে।

গুণমুগ্ধ দিলীপ

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে

ঋষি

আপনারা আমাকে আজ ডেকেছেন শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করতে। মামুলি ভাষায় বলতে লোভ হ'ত বৈকি যে এত বড় সম্মানের আমি যোগ্য নই যদি না আমার মনে জাগত এক বিখ্যাত ভক্ত কীর্তনীর তিরস্কার। বছর দুই আগে একদিন তাঁর কীর্তন শুনতে যাই। তাঁর গান শেষ হওয়ার পরে তিনি আমাকে বলেন একটি কীর্তন গাইতে। তাতে আমি বলেছিলাম মামুলি বিনয়ের সুরে : "আপনাকে গান শোনাবার যোগ্যতা আমার কই ?" তাতে তিনি আমাকে ধমকে দিয়েছিলেন : "ভগবানের গান ভগবানকেশোনাবে, এতে যোগ্যতার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে ?"

শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে এই কথাই আমার মনে হয়। জীবকে তার দুশ্চ্ছেদ্য বাসনাবন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি দিতেই যাঁদের আবির্ভাব, জীবের মনে প্রাণে হৃদয়ে ভাগবত দীপ্তির আবাহনের জন্যে যাঁদের তপস্যা, ঊষর মানস-মর্ত্যভূমিতে আকাশ-গঙ্গার করুণাকে ডেকে আনতেই যাঁদের সাধনা, তাঁদের যে-পূজা আমরা করি সে-পূজার যোগ্যতা সবারই আছে—কেন না এ-পূজার সব চেয়ে জোরালো নৈবেদ্য হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। ভক্তি বলতে ভরসা পেলাম না যেহেতু সে দুর্লভ পদার্থ—বহু করুণায় তবে মেলে তার ছিটেফোঁটা। কৃতজ্ঞতাও সুলভ বস্তু বলি না, কিন্তু কৃতজ্ঞতা থেকেই আমাদের ভাগবত জীবনের সূচনা ব'লে কৃতজ্ঞতার রসবোধ প্রায়ই ভক্তিকামীর মনে জাগে সব আগে। এই জন্যেই হয়ত যুগে

যুগে একথা স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে যে ঋষিকল্প যুগাবতারের পূজার শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা হ'ল কৃতজ্ঞতাই বটে। একটি বিখ্যাত সুফী গজল মনে পড়ে :

সবক্ ঐসা পঢ়া দিয়া তূনে
দিল্‌সে সব কুছ ভুলা দিয়া তূনে
ক্যা বতাউঁ ক্যা লিয়া ময়নে ?
ক্যা কহুঁ ময় ক্যা দিয়া তূনে ?

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ
ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে।
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান ?
কী দিয়েছ হায়, কহি কেমনে ?

যাঁরা তাঁদের ভাগীরথী সাধনায় যুগে যুগে অমর্ত্য আলো নামিয়ে আনেন মর্ত্যলোকে তাঁদের অনুকম্পাকে মানুষ তো চিরদিন এই কথাই ব'লে এসেছে—এ ছাড়া আর তার কী-ই বা বলবার থাকতে পারে ?

তাই শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানপ্রতিভা মনীষা এ সব আলোচনার ধার দিয়েও আমি যাব না আজ, তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনার পণ্ডশ্রমও করব না, আরো এই জন্যে যে এ সম্পর্কে তিনি একবার আমাকে লিখেছিলেন : "Nobody except myself can write my life—because it has not been on the surface for man to see". (আমি ছাড়া কেউ লিখতে পারে না

আমার জীবনী, কেন না মানুষের দৃষ্টি যে-বহির্লোকে সেখানে মিলবে না তার দিশা)। আমি আজ বলব কয়েকটি কথা শুধু তাঁর ধ্যান-দৃষ্টি সম্বন্ধে যার তর্পণে কবি নিশিকান্ত লিখেছেন (যে-গানটি আমি প্রথমেই গাইলাম আজকের সভায়) :—

যেদিন তিমির-বারিধি মথিল তব সাধনার উদয়াদিত্য,
জাগিল সোনার সরণী শোভিয়া বসুন্ধরার ধূলার তীর্থ।
সেদিন মুক্তি লভিল করাল পাষাণ কারার অযুত বন্দী,
তব অসিধার চেতনে খসিল অসুর-বাধার রুধির-গ্রন্থি ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

সুনীল স্ফটিক মূর্ত নয়নে সুদূর সুপ্তি জাগর স্বপ্ন,
উদার ললাট অচল অভ্রে পূর্ণ শশীর বিকাশ-লগ্ন।
গগনে পবনে নব উৎসব আলোক ধারায় বহে আনন্দ,
মন্ত্রমুগ্ধ জগৎজলধি উথলিয়া তোলে জ্যোতির্মন্ত্র ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

উর্ধ্ববিজয়ী প্রগতি তোমার জিনিল সৌর শৈল
তুষার শুভ্র কুন্তলে দোলে কল্ল কল্ল বাহিনী গঙ্গা।
তব তপস্যা মিটালো মর্ত্যে ভীষণ মরুর ঊষর তৃষ্ণা,
ভাসিল অনল-সুধাতরঙ্গে পাতালবাসিনী কামিনী কৃষ্ণা

ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

যুগের প্রলয় প্রবল স্বননে হানে সংগ্রাম অবিশ্রান্ত,
তারি মাঝে তুমি ধ্যান-নিমগ্ন, হে নির্বিচল! হে মহাশান্ত!
তারি মাঝে তুমি বিতরিছ তব শীতল করুণা সলিল বৃষ্টি,
চুম্বনে যার শ্মশান মেদিনী লভে জীবনের নবীন সৃষ্টি ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগল চরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

তুমি ছাড়া আর কাহারো কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না অভয় উক্তি,
তুমি ছাড়া আর কেহ তো আনে না তৃষিতের প্রাণে প্লাবন মুক্তি
হে অখিল গুরু! হে বিশ্বকবি! জপিয়া তোমার পাবক মন্ত্র
বসুধাবক্ষে শত সন্তান বহ্নি-পুলক লভি' অতন্দ্র ॥
ধন্য হইল ধরণীকমল যুগলচরণ তপনে দীপ্ত,
বাজিল বিজয় শঙ্খবিষাণে নবজাগ্রত নিখিল চিত্ত।

এ গানটি তাঁদের কাছে হয়ত উচ্ছ্বাসভঙ্গিম ব'লে মনে হবে যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের বিকাশ-মহিমা ও প্রতিভা-দীপ্তির সঙ্গে সুপরিচিত নন। কিন্তু তাঁকে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা ব'লে জানবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে একথার অন্তর্নিহিত বন্দনার সুরটি স্তবোক্তি ব'লে মনে হ'তেই পারে না। কেন পারে না সে সম্বন্ধে দু'চারটে কথাই আজ আমি বলব আপনাদের কাছে—

কেবল নিতান্ত বন্ধুভাবে—বক্তাভাবে নয়। অর্থাৎ বলব আমি তাঁর সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছি তারই কিছুটা—শোনা কথার পুনরাবৃত্তি না। ভরসা এই যে এ-শ্রেণীর কথা একটু বেশি ব্যক্তিগত হ'লেও অশোভন শোনাবার কথা নয়—যেহেতু এর উদ্দেশ্য পূজ্যজনের পূজা—আত্মবিজ্ঞপ্তি নয়।

সুরু করব একটি প্রশ্ন থেকেই: এ যুগে আমরা কী চাই দ্রষ্টার মধ্যে—স্রষ্টার মধ্যে—জ্ঞানীর মধ্যে? এ জিজ্ঞাসার তাগিদে অনেকেরই মনে বোধ হয় এই জবাবই আসবে যে ঋষির মধ্যে সব আগে চাই আমরা মানবিকতার একটা অখণ্ড সুষমা, 'হার্মনি'। কথাটা একটু বিশদ ক'রে বলতে চেষ্টা করি, নিজে এ বিষয়ে যে ভাবে ভেবেছি তারি ইশারায়।

ইতিপূর্বে শ্রেষ্ঠ মানবদের কাছে, মহাপুরুষদের কাছে মানুষ প্রায়ই চেয়েছে প্রীতির রসধারা, প্রেমের মন্ত্রবাণী, ভক্তির কথামৃত, মাত্র দুচারটি বৈরাগীর কাছে চেয়েছে কঠোর জ্ঞানদীক্ষা। কিন্তু বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানুষের মূল চাহিদা এ যাবৎ হ'য়ে এসেছে হৃদয়বুভুক্ষার খোরাক, মনের নয়। অবশ্য একথা বলাই বেশি যে মানব-হৃদয়ের একটি শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রেমই বটে। এ-ও সমান সত্য যে হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভক্তিতে। কিন্তু তবু বলবই যে, এ যুগে আমরা একটু বদ্‌লে গিয়েছি যে জন্যে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের উপাধি দিয়েছেন "Sons of an age of intellectuality and scepticism and a materialistic denial of spiritual

truth"*—জীবন-জিজ্ঞাসায় আমরা খানিকটা জ্ঞানের এজেহার না পেলে যেন বাঁচি না। কিন্তু জ্ঞান বলতে আমি বুঝছি না সেই জাতীয় বাণী যা এ জগতকে "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" ব'লে বর্জন ক'রে খুঁজেছে সেই অমোঘ নেতিবাদের প্রতিকার যার প্রসাদে এ "অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্"-এ মানুষকে ফের না জন্মাতে হয়। ভারতের এক সনাতন ভাবধারা চিরদিন বয়েছে এই ঐহিকতা বর্জনের খাতেই। আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বিধান রয়েছে কী ক'রে এই নশ্বর লীলালোক উত্তীর্ণ হ'য়ে পৌঁছনো যায় সেই অবিনশ্বর অক্ষয় লোকে যেখানে সব দ্বৈতলীলারই অবসান হয়েছে নিত্য স্থিতিতে—কালহীন অবস্থানে। নজির দিয়ে অযথা আমার অভিভাষণটিকে দীর্ঘ করার দরকার দেখিনা—কারণ অনৈহিকতা—otherworldliness শুধু ভারতে নয় সর্ব দেশেই চেয়েছে এই বিশ্বরূপের রূপলীলা বর্জন: সর্ব দেশের বৈরাগীই বলেছে যে মানবজন্মের নিহিতার্থ হ'ল জন্মচক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া :—

"বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য,
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্।"

(আমি জানি সেই সর্বাত্মা সর্বগত সর্বব্যাপ্ত বিভুকে—যাঁর জ্ঞানকে ব্রহ্মবিৎরা জন্মনিবৃত্তির কারণ ব'লে অভিবাদন করেন।—শ্বেতাশ্বতর)

* The Synthesis of Yoga.

কিন্তু যতই বলি না কেন, আমাদের মন কিছুতেই পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না এ-ধরণের বিতৃষ্ণাবাদ। কিছুতেই কান দিতে পারে না এ-ধরণের কথায় যে, জন্মের অন্তিম লক্ষ্য হ'ল জন্মচক্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া। তাকে যতই তুতিয়ে পাতিয়ে বোঝাই না কেন, সে কিছুতেই সাড়া দিতে পারে না এ-ধরণের বাণীতে যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ধ্বনি-উচ্ছল এই অফুরন্ত প্রাণ-সমারোহের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল এদের গণ্ডী ডিঙিয়ে কোনো অরূপ অরস অগন্ধ অধ্বনি নির্বাণলোকে চিরস্থিতি। তাকে আবহমানকাল নানা ভাষায় দেওয়া হয়েছে বটে এই ভরসাই যে,

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত জীব সবাই ফিরে ফিরে আসে জন্মলোকে, কেবল আমাকে পেলে আর জন্মাতে হয় না)।

কিন্তু এ ভরসায় শুধু যে তার বুক কোন দিনই দশ হাত হ'য়ে ওঠে নি তাই নয়, চিরটা কালই সে শিরপা তুলে এসেছে এ-জাতীয় অমোঘ বন্ধ্যাস্ত্রের বরাভয়ে। মানুষ যদি কখনো একে দৈববাণী মনে করে, সে দৈবাৎ—মানে কালে ভদ্রে, বড় জোর দু-চার জন একপেশো বৈরিগি। এর কারণ আর কিছুই নয় শুধু এই যে যখন বাইরের কুরুক্ষেত্রে, শ্মশানযাত্রায়, মুষলপর্বে মন আমাদের হাহাকার ক'রে ওঠে তখনো অন্তরের অন্তঃপুরে একটা আবছা প্রতীতি জাগেই জাগে যে এজগতের হাজার ত্রুটি গ্লানি থাকলেও দুঃখ শোক আধিব্যাধিই জন্মলীলার গোড়াকার

কথা নয়। আমাদের চেতনার উপরতলায় যখন সব আলো নিভে আসে তখনও অবচেতনার অতলে এ-প্রত্যয় অনির্বাণ হ'য়েই জ্বলে যে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"—"আনন্দ থেকেই সমস্ত জীব জন্মায়, আনন্দেই তারা বাঁচে।" শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বলেছেন তাঁর যুগদীক্ষায় যে বস্তুজগতে আমাদের জন্ম হয়েছে এজন্যে নয় যে বস্তু মিথ্যা, অলীক, ছায়াবাজি: আমাদের জীবাত্মা এ বাস্তব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে শুধু এই জন্যেই যে বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে অনুভূতি উপলব্ধি অভিজ্ঞতা লাভ হয় সে লাভ অন্য কোনো বিকাশ-লীলায় হ'তে পারত না। আর, এ কোনো মনগড়া থিওরি নয়—এ শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে যার কথা তিনি লিখেছেন তাঁর The Life Heavens কবিতাটিতে:

> I, Earth, have a deeper power than Heaven;
> My lonely sorrow surpasses its rose-joys,
> A red and bitter seed of the raptures seven; —
> My dumbness fills with echoes of a far Voice.
> By me the last finite, yearning, strives
> To reach the last infinity's unknown,
> The Eternal is broken into fleeting lives
> And Godhead pent in the mire and stone.

এর অনুবাদ করেছেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী:—

আমি পৃথ্বী, স্বর্গ হ'তে গূঢ়তম শক্তি আছে আমার অন্তরে,

নিরালা বেদনা মোর ওই স্বর্গসুখ হ'তে বহু উর্ধ্বে রাজে,
রক্ত-রাঙা মধুতিক্ত পুলক-সাম্রাজ্য সপ্ত মোর মর্ম ধরে,
মূক মোর এ-আত্মায় দূর এক আহ্বানের প্রতিধ্বনি বাজে।
আমার জীবনে সে যে অন্তিম সীমান্ত সীমা উদ্যমে বিপুল,
চাহে উত্তরিতে কোন্ অজানিত অসীমের দূরতম তীরে,
মোর সাথে শাশ্বত যে রূপ ধরে ক্ষণিকের মরণ-সংকুল,
মোর বক্ষে বন্দী জাগে পরমপুরুষ পঙ্ক পাষাণেরে ঘিরে।

কথাটা কিন্তু ভুল বুঝবেন না। এর মানে নয় যে পৃথিবীটা অতি চমৎকার জায়গা—একেবারে নির্ঘাত কাঁটাহীন গোলাপের অমরাবতী। এ জগতে যদি বা ক্বচিৎ দুচারটা সাধু মহাপ্রাণের দেখা পেয়ে মনে একটু ভরসা জাগে—স্বপ্ন ভাঙতেও বিলম্ব হয় না নিদারুণ বাস্তবতার দৌরাত্ম্যে। মীরা কেঁদেছিলেন কি সাধ ক'রে: "সন্ত দেখ্ দৌড় আই—জগত দেখ রোই!" শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ সম্বন্ধে, তাতে তিনি লিখেছিলেন আমাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে: "**Where do you find in 'The Life Heavens' that the conditions on earth are glorious and suited to the Divine Life ? ... The Earth is an evolutionary world...most sorrowful, disharmonious, imperfect. Yet**"—বলছেন তিনি জোর ক'রে—"**in that imperfection is the urge towards a higher and many-sided perfection. It contains the last finite which yet yearns to be the supreme Infinite. God is pent in the**

mire (mire is not glorious, so there is no claim to 'glory or beauty here) but that very fact imposes a necessity to break through the prison to a consciousness which is ever rising towards the heights. And so on. That is 'deeper power' though not a great actual glory or perfection."

" এ কবিতাটির কোথায় পেলে তুমি এ ইঙ্গিত যে এ পৃথিবীর আবহাওয়া অতি অপরূপ বা দিব্যজীবনের অনুকূল? এ জগৎটা ক্রমবিকাশশীল···দারুণ দুঃখে বৈষম্যে খুঁতে ভরা। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই যে সে পেল নিখুঁৎ ও বহুমুখী সম্পূর্ণতার প্রেরণা। পৃথিবী হ'ল সীমার চরম সীমা—অথচ তৃষ্ণা তার সর্বোত্তম অসীমের জন্যে। ভগবান বাঁধা পড়েছেন পঙ্কের পঙ্কজালে—পঙ্ক মহিমময় নয়, বটেই তো— কিন্তু সেই জন্যেই না চাই এ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ ক'রে উর্ধ্বে আরোহণ।" কারণ—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—"দেবলোকগুলি পূর্ণায়ত ও নিখুঁৎ বটে, কিন্তু আদৌ বিকাশশীল নয়—যেহেতু দেবতারা ভর ক'রে আছেন রকমারি স্তরের রকমারি সম্পূর্ণতা ও সিদ্ধির বনেদে।"

এ-কথার উত্তরে মায়াবাদীরা যা ব'লে এসেছেন তার মোট কথাটা হ'ল হাসি তথা কান্না; হাসি যে,— এ জীবন অমৃতলোক হবে এটা কী ছেলেমানুষি কবিকল্পনা! কান্না যে,—"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।" তাই এঁদের চির-প্রার্থনা হ'য়ে এসেছে "সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ—" আর মন্ত্র হ'য়ে এসেছে:

"এ জীবনটার দুঃখের গোড়া হ'ল এ জগতে জন্মানো — অতএব এখানে জন্মাতে চাওয়াটাই সর্বনেশে, কেননা আসক্তির বনেদ যে সেইখানেই।" আমাদের জীবনব্যাধির এ একটা মামুলি নিদান— তাই এই বৈরাগ্য ও অনৈহিকতাকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে আমাদের নানান অনৈহিকতার বিতৃষ্ণাবাদ। শ্রীঅরবিন্দ দিলেন এর জবাব এই ব'লে যে এধরণের যুক্তি হ'ল শাঁকের করাত— দুধারেই কাটে; মানে, জন্মানোর মধ্যেও যেমন জন্মের প্রতি আসক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, জন্মাতে না চাওয়ার মধ্যেও তেমনি একটি না-জন্মানোর প্রতি আসক্তি লুকিয়ে বসবাস করতে পারে: "Wherefore the attachment to the escape from birth is one of the idols, which, whoever keeps, the sadhaka of the Integral Yoga must break. For his yoga is not limited to the realisation of the transcendent beyond all worlds by the individual soul, but embraces also the realisation of the universal 'the sum total of all souls' and cannot therefore be confined to the movement of a personal salvation and escape." (Synthesis of Yoga)

অর্থাৎ, খতিয়ে জন্মচক্র থেকে অব্যাহতি চাওয়াও হ'ল একটি আসক্তি—কাজেই এও সাজে না পূর্ণ-যোগপন্থীকে। কারণ জীবাত্মা বিশ্বাতিগ পরমাত্মাকে লাভ ক'রে মুক্তি লাভ করে যে যোগবলে সে যোগ তো আমাদের নয়; আমাদের যোগ যে

চায় ঐ সঙ্গে বিশ্বমূর্তি "বিশ্বকর্মা মহাত্মাকে" উপলব্ধি করতে যিনি "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। সুতরাং ব্যক্তিগত মুক্তির পলায়নী বাণীতে সে তুষ্ট থাকতে পারে না।

এ কথায় আমাদের আধুনিক মন যে সহজেই সাড়া দিতে পারে এ বলাই বাহুল্য। কেননা যতই শাস্ত্র আওড়াই, নজির তলব-ক'রে ক্লিষ্ট জীবকে ধম্‌কাই, কথায় কথায় তাকে পাপের শাস্তি অনন্ত রৌরব নরক ব'লে বিভীষিকা দেখাই— মানুষ কোনদিনই একথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেনি যে জন্ম হ'লো এ বিশ্বলীলার এমন একটা দুর্ঘটন বা দুর্দৈব যার একমাত্র স্বস্ত্যয়ন হ'তে পারে নির্বাণযজ্ঞের চিতাশয্যায়। কবি গেয়েছেন বটে :

শুধু দুদিনের খেলা!
ঘুম না ভাঙিতে আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা!
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙি গড়ি
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদের এই দেহ প্রাণ মন
সুখ দুখ এই জীবন মরণ
এও বিধাতার পুতুল খেলা
শুধু গড়া আর ভাঙিয়া ফেলা।

আমরাও তাঁর এ বিলাপে সাড়া দিয়ে এ গান গাই বটে সময়ে সময়ে—কিন্তু সে কখন? না, আমাদের আর্ত মুহূর্তে—দুর্বলতার অন্ধকারে। আলো নিভলে যে ভয়কে অতি প্রত্যক্ষ মনে হয়, আলো জ্বললে দেখা যায় তার কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই যে-বৈরাগী জ্ঞান গাজোয়ারি সুরে বলে "বটেই তো এ জীবন দুদিনেরই খেলা বই আর কী? গতির জোয়ার ভাঁটাই তো জীবনের পরম অনর্থ—" যে-দৃষ্টির চরম ও পরম বাণী হ'ল ভগবানের সৃষ্টিলীলা জৈবলীলাকে নাকচ করা তার তরফে খুব জাঁকালো অপৌরুষেয় নজির হাজিরি দিলেও সে সব নজিরে আমাদের মন শুধু যে আশ্রয় পায় না তাই নয়—বেশি জোর করলে বেঁকে বসে, বলে—"চাই নে অমনধারা ওষুধ, কেন না সংসারের আধিব্যাধির ধারা সঙিন হ'লেও এ রোগের এমনতর ওষুধ যে আরো সঙিন, ব্যাধি বিকট হ'লেও তবু সওয়া যায় কিন্তু চিকিৎসা যদি হয় উৎকট তবে তাকে দূর থেকেই করি দণ্ডবৎ।"

একথা মানতেই হবে যে, এক শ্রেণীর লোক এই উৎকট অনৈহিকতার মধ্যে দিয়ে এক ধরণের সার্থকতা খুঁজে পেয়ে থাকেন। কারণ দ্বৈতবাদের লীলালোক বিধৃত রয়েছে এক কালহীন অদ্বৈত সত্যে—বটেই তো। কিন্তু তবু এই অদ্বৈতও জীবনের বিবর্তনে (অন্তত বহু দিন ধ'রে) স্ফূর্তি পেয়ে থাকে দ্বৈতেরই মধ্যে দিয়ে। তাই, বলতেন পরমহংসদেব, "নিত্য লীলা দুই-ই নিতে হবে, বেলের শাঁসখোলা দুই-ই নিতে হয়, নৈলে ওজনে কম পড়ে।"

ঈশোপনিষদেও এ কথার স্বপক্ষে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা শুধু অবিদ্যার উপাসক তারা অন্ধতমসায় ডোবে বটে, কিন্তু যারা বিদ্যার উপাসক তারা ডোবে আরও গভীর অন্ধকারে। শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বলেছেন বার বার তাঁর প্রায় সব বইয়েই, বিশেষ ক'রে তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ জীবনবেদে: Life Divine ও Synthesis of Yoga-এ। বলেছেন যে, না, জীবনকে এভাবে বর্জন ক'রে ঐহিকতাকে স্রেফ ছেঁটে বাদ দিয়ে চলতে গেলে ভগবানকে পুরোপুরি মানা হয় না—হতে পারে না। কেন না এধরণের বিসর্জনবাদ জ্ঞানের চরমবাণী নয়—এ শ্রেণীর পারলৌকিকতা বড় জোর আমাদের ধ্যানের একটা আংশিক দর্শন মাত্র—তার বেশি নয়, কেন না,

"An individual salvation in heavens beyond careless of the earth is not our highest objective: the liberation and self-fulfilment of others is as much our concern—we might almost say, our divine self-interest—as our own liberation." (Synthesis of Yoga)

অর্থাৎ, এ ভূ-লোকের প্রতি উদাসীন থেকে কোনো সুদূর স্বর্লোকে স্থিতি লাভ ক'রে যে ব্যক্তিগত মুক্তি সে-মুক্তি আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য নয়: অপরের মুক্তি তথা আত্মসিদ্ধিও আমাদের কাছে তেমনিই অপরিহার্য যেমন অপরিহার্য আমাদের ব্যক্তিগত

জীবন্মুক্তি। এমন কি এ বললেও বেশি বলা হবে না যে অপরের মুক্তিলাভ আমাদের দিব্য স্বার্থের অঙ্গীভূত।

এই যে দৃষ্টি, এ শ্রীঅরবিন্দের কাছে কথার কথা নয়—তাঁর সাধনার একটি উজ্জ্বলতম বিকাশ। কারণ এই দৃষ্টিতেই তিনি পৌঁছেছেন তাঁর আর্ষ সাধনায় যার অন্তর্জ্যোতিতে তিনি দেখতে পেলেন যে:—"The evolutionary endeavour of Nature has experimented on all lines in order to find her true way and her whole way towards the supreme consciousness and the integral knowledge."*

অর্থাৎ, প্রকৃতি মানুষকে বিবর্তনের পথে রওনা ক'রে দিয়েছে নানা পথের খবর নিয়ে তবে—কেননা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চ'লে চ'লে তবে সে পায় পরম চেতনার পথের দিশা সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানের নিত্য ইঙ্গিত।

এই ধরণের যে দৃষ্টি, তাকেই বলছিলাম এ যুগের একটি মুখ্য তৃষ্ণা। এ যুগের মানুষ পারে না অতীত যুগের কোনো একটা কাটা ছাঁটা বৈরাগ্যের খাতে চলতে তা সে বৈরাগ্য সাংসারিক ত্রিতাপের যে নিরসনেই কেন না আমাদেরকে রাতারাতি পৌঁছে দিক।

এ ধরণের দৃষ্টি কী ভাবে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যাননেত্রে ফুটে উঠেছে তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে ক'রে ফল হবে ভয়াবহ: মানে আমার অপটু প্রবন্ধের শিশুস্কন্ধে

* The Life Divine—"The Evolution of the Spiritual Man"—অধ্যায়

ভর করবে হিমালয়ের ভার। তাই ও অসাধ্য সাধনে আমি এগুব না—নমুনা হিসাবে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব শ্রীঅরবিন্দ কী ভাবে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন: শুধু গভীর ভাবে নয়—খুঁটিয়ে।

তাঁর "দিব্য জীবন" জীবনবেদের তৃতীয় খণ্ড 'The Evolution of the Spiritual Man' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন যে, মানুষের আত্মবিকাশের চারটি মূল চাহিদা আছে যে গুলির হিসেব না রাখলে জীবন সংগ্রামে আগুয়ান হ'য়ে চলা তার পক্ষে হ'য়ে ওঠে দুরূহ। এ চারটির বর্ণনা করেছেন তিনি এই ভাবে:—

পয়লা নম্বর, তাকে জানতে হবে নিজেকে, আবিষ্কার করতে হবে নিজের সব নিহিত সম্ভাবনার তাগিদকে (He must know himself and discover and utilise all his potentialities). কিন্তু এ আত্মজ্ঞানের জন্যে তাকে ডুব দিতে হবে—কোথায়? না, নিজের সত্তার অতল তলে—কেন? না, অনতল বহিঃ-প্রকাশের অতিপ্রত্যক্ষ লোকে মিলতে পারে না মানব হৃদয়ের মূল তৃষ্ণার পরম ইঙ্গিত। কাজেই এল দোসরা নম্বর: আমাদের জানতে হবে নেপথ্য তত্ত্ব (occultism) অর্থাৎ রাখতে হবে সেই সব নেপথ্য শক্তির গতিবিধির খবর যারা এ জগতের নানান প্রকাশ্য চালচলনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু এই নেপথ্যলোকের পরিচয় পেতে গিয়েই মানুষের পরিচয় হ'ল আনুষ্ঠানিক ধর্মের (religion) সঙ্গে যার অভিপ্রায় হচ্ছে "to link the human with the divine and in so doing sublimate the thought

and life and flesh so that they may admit the rule of the soul and spirit." অর্থাৎ, কিনা ধর্ম চাইল মানুষ ও ভগবানের মধ্যে ঘটকালি ক'রে তার মন প্রাণ ও দেহকে ঢেলে সাজাতে রূপান্তরিত করতে, যাতে ক'রে এরা ঠিক মত অন্তরাত্মার হুকুমবরদার হতে পারে। কিন্তু এটা সুসম্পন্ন করতে হ'লে যে-জ্ঞানের ডাক পড়ে সে কোনো একটি বিধি বা অনুশাসন (creed) হ'লে চলবে না, এমন কি কোনো একপেশো অতীন্দ্রিয় উদ্‌ঘাটন (mystic revelation) হলেও না : এর জন্ম দেখতে হবে যাতে ক'রে তার চিন্তাশীল মন এই জ্ঞানকে আত্মসাৎ ক'রে ইন্দ্রিয়-জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মবিকাশের কাজে লাগাতে পারে। একেই তিনি বলেছেন তেসরা নম্বর : কিনা দর্শন—philosophy. কিন্তু এ-দর্শন যদি হয় য়ুরোপের মানস আতসবাজি তাহলে আর যাই থাকুক না কেন আখের থাকবে না। শেষ রক্ষা করতে হ'লে দর্শনকে হ'য়ে উঠতেই হবে আধ্যাত্মিক দর্শন—spiritual philosophy : সুতরাং এর পরেই এল চৌঠা নম্বর : আধ্যাত্মিক অনুভব উপলব্ধি spiritual realisation experience. তিন থেকে চার এল কেন ? না কোনো জ্ঞান বা প্রচেষ্টাই ঠিক মতন ফলপ্রসূ হতে পারে না যতক্ষণ না তারা অনুভব উপলব্ধির কোঠায় রসায়িত হয়ে উজ্জ্বল হয়, চেতনায় অনুস্যূত হ'তে পারে। "তাই"—বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ—"ধর্মের গুহ্যতত্ত্বের বা দার্শনিকতার জ্ঞান ও উদ্যমকে আধ্যাত্মিক জগতে ফলপ্রসূ করতে হ'লে চাই আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে সেই সব

অনুভব উপলব্ধির রাজ্যে আশ্রয় পাওয়া যার ফলে চেতনা হ'য়ে ওঠে বিস্তীর্ণ, সম্পৎশালী এবং জীবন প্রতিষ্ঠা পায় সেই সব শুভকর্মে যারা আত্মিক সত্যের আত্মীয় ব'লে গণ্য হ'তে পারে" :—

"But all knowledge and endeavour can reach its fruition only if it is turned into experience and has become a part of the consciousness and its established operations; in the spiritual field all this riligious, occult or philosophical knowledge and endeavour must, to bear fruition, end in an opening up of the spiritual consciousness, in experiences that found and continually heighten, expand and enrich that consciousness and in the building of a life and action that is in conformity with the truth of the spirit."*

এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি না দিলেও হয়ত চলত, কিন্তু এর উদ্দেশ্য শুধু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো কী ধরণের সমগ্রদৃষ্টি অখণ্ডদৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান-নেত্রে উন্মুক্তি লাভ করেছে তাঁর অনন্যতন্ত্র প্রাতিভজ্ঞান তথা মহিমোজ্জ্বল মনীষার দিব্যসন্ধানে। আমি বলতে চাইছি যে এই ধরণের দৃষ্টিই আমাদের আধুনিক মনের কাছে শুভ, এরই আলো আমাদের আধুনিক জীবনের জটিল কাঁটাবনে বাতি ধরতে পারে; শুধু "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" ধরণের নীতিতে আমাদের আধুনিক মন পুরোপুরি সাড়া

*The Life Divine—Vol. II, pp. 866.

দেয়না, দিতে পারেনা। অন্তত আমি নিজে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হই তাঁর এই ধরণের সমগ্র দৃষ্টির মহিমায়। জগতে নানা মনীষীর সঙ্গেই একটু আধটু ঘনিষ্ঠতা হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু খাঁটি ঋষিদৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া অন্য কারুর চোখে দিব্যপ্রভ হ'য়ে উঠতে আমি দেখিনি। এমন কি এর আগের যুগে— পরমহংসদেবের অপরূপ কথামৃতেও এ-ধরণের চিন্তার কোনো আভাষ পাই না। তাঁর প্রিয় উক্তি মনে পড়ে, "কী হবে জীবনের নানা তত্ত্ব নিয়ে মাথা বকিয়ে? তুমি লাভ করো ভক্তি যা মানবজীবনের উদ্দেশ্য— আম খেতে এসেছ আম খাও, আমগাছে কত শাখা কত প্রশাখা কত পাতা সে হিসেবে কাজ কী?" কথাটা সরলতার দিক দিয়ে শুনতে চমৎকার হ'লেও অনুসন্ধিৎসু মানুষ কোনদিনই এ-ধরণের অতি সরল সমাধানকে সানন্দে বরণ করেনি —যখন বরণ করতে বাধ্য হয় খুঁৎ খুঁৎ ক'রেই করে—অগত্যা under protest. যদি প্রশ্নহীন সরল ভক্তির দিকে ছোটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত তাহ'লে হয়ত জীবনের অনেক দুঃখেরই সহজে উপশম হ'ত, কিন্তু হ'লে হবে কি, আমাদের জীবন বিচিত্র, বহুমুখী তার গতিপ্রবণতা মতিগতি। কাজেই আম খেতে এসে শুধু আমের রসতত্ত্ব ছাড়া আরো অনেক কিছুই আমাদের জিজ্ঞাসু মনের কাছে অত্যাবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এই জিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণার জলই এনে দিলেন হাতে ক'রে, ক্ষুধার সুধা এনে দিলেন তাঁর অপরূপ ভূয়োদর্শী দৃষ্টিতপস্যার আবাহনে—যেমন এনে দিয়েছিলেন ভগীরথ তাঁর গাঙ্গ সাধনায়।

কিন্তু তা ব'লে আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না : আমি বলি না এ সব মামুলি মকরধ্বজের কোনো উপকারিতাই নেই। জীবনে মানুষ যুগে যুগে একই সত্যকে খুঁজে এসেছে তার বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, আর সে সত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বটে। কিন্তু, বলেছি, জৈবলীলার প্রবণতা এক নয়—বহু। তাই যুগে যুগে সব দেশেই আমরা নানা দিক দিয়ে চেয়েছি পরম সত্যস্বরূপকে। তাছাড়া জিজ্ঞাসার ও যাচাইয়ের কোন একটা সার্থকতা আছেই আছে, নৈলে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে নচিকেতার জন্ম হ'ত না যে বিলাস ভোগের অশেষ উপকরণ হাতে পেয়েও বলে "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" :—বিত্তগৌরবে মানুষের মনুষ্যত্ব তর্পিত হ'তে পারে না—সে চায় জানতে আরো জানতে। তার বাঞ্ছিত অমৃত হ'ল আধ্যাত্মিক সত্য : "যোঽয়ং বরো গূঢমনুপ্রবিষ্টো নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে"—"যে বর গভীরের অন্তর্নিহিত নচিকেতা সেই বর চায়—আর কোনো বর নয়"। আর সে কেমন জানা ? না, নানাদিক থেকে জানা, তন্ন তন্ন ক'রে জানা। এই জন্যেই মানস জিজ্ঞাসার উপযোগিতাকে শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেন নি, বরং বলেছেন—বারবারই—যে এ জিজ্ঞাসাও ঠিক পথে চালিত হ'লে আমাদের পথ চলায় অনেকখানি আলো দিতে পারে : বলেছেন যে যুক্তি আমাদের ঊর্ধ্বপ্রগতির সহায় হ'তে পারে যদি সে আমাদের প্রাণ মনের ও ঊর্ধ্বলোকের মধ্যে ঘটকালি করতে রাজি হয়—"if it (Reason) is a mediator between the life and body and something greater within him." *

* The Life Divine-এর শেষ "The Divine Life" অধ্যায়, ১১৫৯ পৃষ্ঠা

কিন্তু মুশকিল হয় কি, যুক্তি তার স্বকীয় সাধনায় একটু আধটু আলো পেতে না পেতে নিজেকেই ভেবে বসে চরম দিশারি, ভাবে তার দাঁড়িপাল্লায় যে সত্যের ওজন হয় না সে 'অসিদ্ধঃ প্রমাণাভাবাৎ'। এধরণের একদেশদর্শিতায় মানুষের কেন মুক্তি নেই তার কারণও শ্রীঅরবিন্দ নানা যুক্তির নানা ছন্দে সুরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে ব্যাখ্যার সার মর্ম এই যে—"The mind is really a reflector and a medium and none of its activities originate in themselves, none exist *per se*." * অর্থাৎ "মন হ'ল আসলে একটি দর্পণ, বাহন, তার ক্রিয়াকলাপের কিছুই স্বয়ংভব নয়—সে যে স্বয়ংসিদ্ধই নয়।"—নয় ব'লেই শ্রীঅরবিন্দ বারবার বুদ্ধির ভাষাতেই তার সীমানার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর খরদীপ্ত ক্ষুরধার ভঙ্গিমায়, দেখিয়ে দিয়েছেন যুক্তি দিয়েই (কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলতেন না পরমহংসদেব?) কেন নির্ভেজাল যুক্তি মানবজাতিকে বেশি দিন প্রগতির খোরাক জোগাতে পারে না:—"Reason by itself cannot long maintain the race in progress." † কেন না মানুষ তার মানবতার চৌহদ্দি পেরুতে পারে কেবল সর্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিক সাধনায়:—"A total spiritual direction given to the whole life and the whole nature can alone lift humanity beyond itself."

* The Synthesis of Yoga. † The Life Divine.

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে : যে, শ্রীঅরবিন্দের আধুনিক ধ্যানদৃষ্টি কোনো সনাতন ধ্যানদৃষ্টিকেই পুরোপুরি অস্বীকার করেনি গায়ের জোরে। তাঁর মধ্যে পাই আমরা একটা বিশ্বভৌম catholicity ঔদার্য—যার গঙ্গোত্রী-প্রেরণা নেমেছে তাঁর তাপস প্রতিভা থেকে। তাই তিনি একদিকে যেমন অতীত সত্যকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পেরেছেন, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে তার অসম্পূর্ণতাও দেখিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন নি,—যখনই এ নির্দেশের প্রয়োজন হয়েছে। আমাকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে অতীত মহিমা অতি চমৎকার বস্তু বটে, কিন্তু তাই ব'লে তার এলাকায় বাঁধা পড়লে চলবে না, অতীত যুগ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন ভবিষ্যৎকে হ'তে হবে উজ্জ্বলতর :—"The tradition of the past is a great thing in its own place, but that is no reason why we should go repeating the past. A great past should be followed by a greater future."

এই ধরণের উদার আধুনিকতা, নির্ভীক সমন্বয়, শ্রদ্ধালু বিশ্লেষণ ও তেজস্বী গভীরতা শ্রীঅরবিন্দের বাণীমন্ত্রের প্রতি শ্লোকে কল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে। তাই সে-বাণী এযুগের অনেক নির্ভীক তত্ত্বজিজ্ঞাসুদেরকে এত গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে—যার ফলে তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারেন না যখন শোনেন : "We do not belong to the past dawns but to the noons of the Future." *

* The Essays on the Gita.

অতীত যুগের গোধূলির স্মৃতি-সন্তান মোরা নহি :
অনাগত যুগমধ্যাহ্নের আবাহনে জেগে রহি।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদের মতন অল্পদর্শীর মুখেও বক্তব্য যেন ফুরুতেই চায় না—কেন না তাঁর চিন্তার তহবিল এতই সম্পৎশালী যে তা থেকে রত্নমণি আহরণ করা অতি সহজ : তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠছে মণিমুক্তার ঝিকিমিকি। কিন্তু আমার আজকের ক্ষুদ্র অভিভাষণ বেচারিকে এ-চয়নের লোভ সামলাতেই হবে, কেন না তাঁর বিরাট প্রতিভার পরিচয় দেওয়া শুধু যে অসম্ভব তাই নয়—তাঁর চিন্তাভাণ্ডারের হাজারো সম্পদের কোনো সূচীপত্র প্রস্তুত করাও দুঃসাধ্য। একথা শুনলে দুচার জন বিজ্ঞ সংশয়ী হয়ত হাসবেন—ভক্তের সেই মামুলি উচ্ছ্বাস ব'লে। কিন্তু সত্যিই যে এ উচ্ছ্বাস নয় তা তাঁরাও বুঝতে পারবেন যদি একটু শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভাবমন্দিরে একবার প্রবেশ করেন। তখন বুঝতে পারবেন তাঁরা যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম তো শুধু আমাদের মানস-কোষাগারকে আরো বিত্তশালী করতেই নয়—তাঁর সাধনা আমাদের সংশয়াকুল মনের অন্ধকারে এনে দিল সেই পারমার্থিক আলোকসত্যের অফুরন্ত পাথেয় যার অনাদরের ফলেই আজকের মানুষ এমন ক্লিষ্ট অবসন্ন, যার অভাবেই মানুষ আজ আসন্ন ধ্বংসের ত্রাসে ত্রস্ত, যার অবসানের জন্যেই আজ সভ্য মানুষের মধ্যে ফের বর্বরতা উঠেছে মাথা চাড়া দিয়ে—"it is the resurgence of the barbarism in ourselves, in civilised man, that is the peril and this we see all

around us."* কিছু দিন আগে এক আমেরিকান রাষ্ট্রনায়ক এ-ট্রাজিডির কথা বলেছিলেন ঠিকই যে আজকের মানুষের সর্বনাশ হয়েছে এইজন্যে যে "man's mind is spending all its ingenuity to keep his spirit enslaved."

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছে এসেছেন এই spirit-এর প্রতিভূ হ'য়ে: পারমার্থিক আলোর স্তম্ভরূপে, আত্মিক দিশার দিশারি-রূপে, চিরন্তন আনন্দের বরদাতারূপে, আন্তর বিশ্বাসের সারথি-রূপে। এ-যুগে মানুষ আজ দিকে দিকে ক্ষিপ্ত রক্তলোলুপ, মিথ্যাই আজ তার জপমালা—বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রতন্ত্রে। তাই তো সে আজ এমন নির্লজ্জ হুঙ্কার দিচ্ছে: "বলং বলং বাহুবলম্"—ঘোষণা করছে: ভগবান হ'ল মানুষের একটি আদিম কুসংস্কার যার মূল শিকড় রসপুষ্ট হয় অবচেতন ভয়ের আঁধার রসাতল থেকে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দুষ্কর তপস্যার মহিমময় দৃষ্টান্তে দেখালেন আমাদের নতুন ক'রে যে—

"The ascent to the Divine Life is the human journey, the work of works, the acceptable sacrifice. This alone is man's real business in the world and the justification of his existence, without which he would be only an insect crawling among other ephemeral insects on a speck of surface mud and

* The Life Divine-এর শেষ অধ্যায়, ১১৫৯ পৃষ্ঠায়।

water which has managed to form itself amid the appaling immensities of the physical universe."

"মানবজীবনের পরম সাধনা শুধু দিব্যজীবনের অভিসার। বিশ্বলীলায় শুধু এই-ই তার করণীয়—তার জীবনের নিহিতার্থ। এ অর্থ যদি সে খুঁজে না পায় তা হ'লে সে হাজারো কীট পতঙ্গের অন্যতম হ'য়ে যাপন করে এক শ্রীহীন মলিন পঙ্কিল জীবন—এই বস্তুজগৎ তখন হয়ে ওঠে শুধু এক নিদারুণ মরুভূমির নিরন্ত পরিব্যাপ্তি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরে এ ভাষায় ভাগবত কথামৃত কেউ আমাদের পান করায় নি এযুগে। কেউ আমাদের সাহস ক'রে বলতে পারে নি এ বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যের অজ্ঞতার দাপটে যে, ভগবানকে না জানলে কিছুই জানা হয় না, তাঁকে না পেলে সর্ব কর্মই হয় অকৃতার্থ, কেবল ভাগবত জীবনই হ'ল মানুষের একমাত্র সাধনা। অবশ্য এ-ধারণা অনেকের মনেই উপ্ত আছে সুপ্ত হ'য়ে, কিন্তু আমাদের এ নিহিত ঘুমন্ত অনুভবটি জেগে উঠতে মহাপুরুষদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সোনার কাঠির অপেক্ষা রাখে। তাই তো যুগে যুগে যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন অধর্মের অভ্যুত্থানের তামসী রজনীতে তিনি অবতীর্ণ হন যুগাবতারের নবারুণচ্ছটায়। পরমহংস-দেবের অবতরণ আমাদের ভারতে এই শ্রেণীর অবতরণ। কিন্তু হ'লে হবে কি, সংকীর্ণ বিচার-বুদ্ধির একাধিপত্যের এ-ধুমধড়াক্কার যুগে পরমহংসদেব ভক্ত-হৃদয়ে সিংহাসন পেলেও মনঃশক্তিমানদের

* The Life Divine—"Man in the Universe" অধ্যায়, ৬৫ পৃষ্ঠা।

মধ্যে বোধ করি তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। না করার জন্যে তাঁর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিই হয়নি অবশ্য। পরমহংসদেবের সেই বিখ্যাত কথিকা (parable) আপনাদের তো জানা আছে? সেই যে কোহিনুর নিয়ে গিয়েছিলেন এক বিক্রয়ার্থী বেগুনওয়ালার কাছে? বেগুনওয়ালা বলল: "এর বদলে বড়জোর দশটি বেগুন দিতে পারি।" তারপর গেলেন তিনি এক কাপড়ওয়ালার কাছে। সে বলল: "এর বদলে বড়জোর দশ থান কাপড় দিতে পারি।" শেষে তিনি এক জহুরির কাছে যেতেই সে হাঁকল: "দশ লাখ টাকা দেব।" তাই আজকের দিনে এই পরিভাষায় বড় গলা ক'রেই বলা যায় বৈ কি যে, শ্রীরামকৃষ্ণরূপী হীরকমণিকে যদি বুদ্ধিবাদী বা বৈজ্ঞানিক বেগুনওয়ালারা চিনতে না পেরে বলে ওঁর দাম দশটি বেগুনের বেশি নয় তাহ'লে তাতে ক'রে হীরকের মহিমা না-মঞ্জুর হয়না, হয় শুধু বেগুনওয়ালার সমজদারিয়ানাই নাজেহাল।

আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য: আমাদের মানস লোকে যে-শ্রেণীর দীপ্তি সহজে প্রতিষ্ঠা পায় সে-শ্রেণীর বিভূতি এ-যুগে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে অপূর্ব আভাময় মহিমায় বিকাশ লাভ করেছে, অন্য কোনো সাধুসন্ত যুগাবতারের মধ্যেই এ-আভা এমন পূর্ণায়ত হ'য়ে ওঠে নি। অন্তরাত্মার ভাষা ছন্দ মন্ত্র এমন চিন্ময় হ'য়ে ওঠেনি অন্য কারুর প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে কবিত্বে, দর্শনে, বিচারে, বিশ্লেষণে—সর্বোপরি বহু বর্ষব্যাপী নীরব-তপস্যালব্ধ নব-আদিত্যের কিরণ-সম্পাতে। এ সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত কথা ব'লেই এখানে ইতি টানবো।

আবাল্য আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই ডেকেছি এ যুগের দিশারি' ব'লে। তাঁর কথামৃতের প্রতি ভাগ অন্তত পঞ্চাশবার পড়েছি। আপনাদের কাছে এসেছি আজ বন্ধুভাবেই দুটো মনের কথা বলতে, তাই বলিই না কেন একটা কথা এ প্রসঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দের "Life Divine" বইটি পড়বার আগে আমি প্রায়ই বলতাম একটা কথা। কথাটা এই যে, যদি আমাদের স্বরাজ লাভ হ'লে হঠাৎ প্রেসিডেণ্ট হ'ন কোনো বাঙালি ওস্তাদিপন্থী তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পুলিপোলাও চালান দেবেন এই চার্জে যে আমি বাংলা ভক্তি-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশকে হিন্দুস্থানি ওস্তাদি সঙ্গীতের চেয়ে বড় সৃষ্টি ব'লে থাকি। তবে এ অক্ষমণীয় অপরাধেও যদি আমাকে তিনি এই ব'লে সান্ত্বনা দেন: "কী করব বাপু? ল এণ্ড অর্ডার রাখতেই তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাতে হ'ল, তবে কি না আমরা স্বভাবতই দয়ালু, কাজেই তোমাকে একটি মাত্র বই নিতে দেব—কিন্তু একটির বেশি নয়। কী বই সঙ্গে নেবে তুমি?" তাহ'লে আমি বলব "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।"

কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে যে আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হ'ত থেকে থেকে, যার কোনো জবাবই আমি পেতাম না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর মধ্যে। অবশ্য এ আমি বুঝি যে এসব সংশয়-কুজ্ঝটিকা মুহূর্তে কেটে যাবে অরুণোদয়ে যেমন কাটে অন্ধকার কিন্তু ভগবৎলাভের পথ দুর্গম: অভিসারের বাঁশি শোনা আর অলখ বংশীধারীর দেখা পাওয়া এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান সময়ে সময়ে অফুরন্তই মনে হয় অভিসারীর কাছে। এই মধ্যবর্তী

অবস্থায় তীর্থপথে মানস প্রশ্নের নানা নিরাশার ঝড় তুফান সময়ে সময়ে হৃদয়ের আলো দেয় নিভিয়ে। তাই সে সময়ে স্বতই সাধুসন্ত-মহাপুরুষদের বাণীর দিকে মন ছোটে আকুল হ'য়ে। কিন্তু যেহেতু মন তার নিজের এলাকাকে কিছুতেই পুরোপুরি পেরিয়ে যেতে পারে না সেহেতু তীর্থযাত্রীকে মধ্যপথে নানা আপ্তবাক্যের কাছে হাত পাততেই হয়। অন্তত আমাকে হয়েছিল। কিন্তু যতই যেতাম এর ওর তার কাছে ততই মন যেন আরও উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ফিরে আসত—কেন না মনের তৃষ্ণা তাঁরা মিটাতে পারতেন না কোনো অপরোক্ষ উপলব্ধির এজাহারে। একে ওকে তাকে দেখতাম, আর কেন জানি না মন প্রশ্ন ক'রে বসত: "আচ্ছা এই যে সব মস্ত মস্ত দিক্‌পাল দেখলে তুমি, যাঁদের কথায় এত আনন্দ পেলে আলো পেলে ব'লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলে —তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চাও বেশ কথা, খুব ভালো কথা —কেবল একটা কিন্তু তবু রইল না কি?—তুমি এঁদের কারুর কাছে পেলে কি সেই আলোর আলো যা তুমি আকৈশোর চেয়ে এসেছ? মনে হ'ল কি এঁদের কেউ পেয়েছেন সেই উপলব্ধি 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—যে লাভের পর আর কোনো লাভকে লাভই মনে হয় না?" অমনি মন মাথা নেড়ে বলত: "নহে নহে নহে।" এখানে কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না: গুণীর গানে আবেশ আছে, চিত্রীর ছবিতে পুলক আছে, চিন্তাশীলের চিন্তায় ভাব আছে, কবির কাব্যে চমক আছে—সবই মানি। ভাগবত সত্যের আংশিক রূপরস এঁরা সবাই বিতরণ

করেন—এও জানি। কিন্তু তবু অন্তরাত্মা যখন জাগে তখন এসব মধ্যবর্তী প্রভায়, আংশিক সৌন্দর্যে, তার ক্ষুধা মেটে না, কেন না, তখন সে সব ছেড়ে চায় সেই মন্ত্রের উদ্‌গাতাকে যে বলতে পারে জীমূতমন্দ্রে: "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। কিন্তু দুঃখ এই যে এ-শ্রেণীর মহাপুরুষ আমার চোখে পড়ে নি সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে। তাই চমকে উঠেছিলাম যেদিন দেখলাম শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সালে যেদিন তিনি প্রথম আমাকে বললেন নিশ্চিতির শান্ত সুরে যে ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায় এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভবে।* বিশ্বাস হ'ল মুহূর্তে কেন না তাঁর স্বরে বেজে উঠেছিল সেই সুর যে সুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভব বিনা বেজে উঠতে পারে না। তাই আমার বহু অজ্ঞান সত্ত্বেও তাঁর আলোক মহিমার মর্ম একটু প্রবেশ করেছিল আমার মনের আঁধার অন্তঃপুরে যেখানে লক্ষ জিজ্ঞাসা লক্ষ বাসনা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলত জীবনের সব ঐহিক আনন্দের দেয়ালি নিভিয়ে দিয়ে। তাই তাঁকে বরণ করতে পেরেছিলাম যুগাবতার ব'লে—যেমন বাল্যে বরণ করেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। প্রশ্ন আসেনি, তর্ক আসেনি, ভ্রান্তি যে এর পরেও সম্ভব এ শঙ্কাও মনে উদয় হয়নি। কেবল দুঃখ হ'ত যে শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের দেশের তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা সবাই এমনি সহজে আজও অঙ্গীকার করতে পারেন নি।

* "তীর্থঙ্কর" বইটিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে লেখকের কথোপকথনের অনুলিপি দ্রষ্টব্য।

একদিন পারবেনই এ আমি জানি অবশ্য, কিন্তু তবু যাঁর করুণায় আমার হৃদয়ের আঁধার অতলে নেমেছে আলোর ছটা তাঁকে সবাই এখুনি এখুনি না মানলে মন দুঃখ পেত প্রথম প্রথম। কিন্তু এখন বুঝেছি যে বড় দীপ্তিকে বড় সত্যকে চিনতে পারা সব সময়ে সহজ হয় না। কেন হয় না সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা বকানো এ তর্পণে একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে ব'লে শুধু এই কথাটি ব'লেই আমি আজ সমাপ্তি টানব যে, আজকের বৈজ্ঞানিক হাহাকারের যুগে, বুদ্ধির আত্মম্ভরিতার যুগে, আধ্যাত্মিক সত্যে প্রগতিবাদীদের অশ্রদ্ধার যুগে, আমাদের দরকার ছিল এমনিই একজন অপরূপ মন্ত্রঋষির যিনি বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, মনীষায়, কবিত্বে, চিন্তাশীলতায় বরেণ্যতমদের অগ্রণী হওয়া সত্ত্বেও শাশ্বত সত্যের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারেন যে :

"ভাবিকালের অতিমানস সত্যের পূজারী পারবে না মনের আদর্শ মনের বিধিবিধান মেনে নিতে, পারবে না নিজের অহংবুদ্ধির জন্যে বা বিশ্বমানবের জন্যে বা সমাজের জন্যে বা রাষ্ট্রের জন্যে বাঁচতে। কারণ সে যে এ সব অর্ধসত্যের ঊর্ধ্বলোকের যে সত্য তার সাযুজ্য লাভ করেছে—জেনেছে সেই দিব্য সত্যকে যার জন্যে তার জীবন ধারণ যার ইচ্ছাকে সে অঙ্গীকার করে উদারভাবে নিজের ও সর্বভূতের মধ্যে সেই আলোকের আশ্রয়ে যা বিশ্বাতিগ অর্থাৎ বিশ্বরূপের মধ্যে রূপ নিলেও এ রূপকে ছাড়িয়ে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি"—

"The gnostic being will not accept the mind's ideals and standards ; he will not be moved to live

for himself, for his ego, or for humanity or for others or for the community or for the state; for he will be aware of something greater than these half-truths, of the Divine Reality, and it is for that he will live, for its will in himself and in all, in a spirit of large universality in the light of the Transcendence."*

আধুনিক "ইস্‌ম্‌"-দের এ সংকট বিভ্রান্তির যুগে, স্বার্থবোধের এ শোকাবহ প্রতিষ্ঠার যুগে, যান্ত্রিকতার এ সাংঘাতিক যন্ত্রণার যুগে, বিজ্ঞানের এ দুরন্ত কাপালিকতার যুগে শাশ্বত সত্যের মৃত্যুহীন মন্ত্রের পুনরবতরণের জন্যে এম্‌নি দীপ্ততপঃশক্তিমান্ মহাঋষির জীবন-সাধনারই বুঝি দরকার ছিল।

* Gnostic being বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন অদূর ভবিষ্যতের সেই আধ্যাত্মিক সত্যপ্রতিষ্ঠ মানুষ যে পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হবে অতিমানস লোকের আলোয়—যার অবতরণের জন্যেই তাঁর দুশ্চর তপশ্চর্যা।

জ্ঞানী

শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, কানপুর ১৬. ৮. ৩৮

শ্রীদিলীপকুমার রায়, পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার সহিত আপনার বাহ্যত কোনো পরিচয় না থাকলেও আপনি আমার অপরিচিত ন'ন। আপনার লেখা প্রায়ই পড়ি ও তা থেকে আলোক পাবার প্রয়াস পাই। আপনাকে দর্শন করবার, সৌভাগ্যও বহুবার হয়েছে। আপনারা জনসাধারণের অজানা ন'ন ব'লেই চিঠিতে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে সাহসী হয়েছি। আশা করি ত্রুটি নেবেন না। কিছুদিন আগে শ্রীঅরবিন্দের একটি উদ্ধৃতি চোখে পড়েছিল। আপনাকে তিনি লিখেছিলেন: "To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does, but by what he becomes."

বড় সুন্দর। স্বতই মনে হয় যে মানুষের ঐ পরিমাপই যথার্থ—সত্য। কতবার যে এ নিয়ে ভেবেছি ও অন্তরে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছি বলতে পারিনে। তবু দুএকটা প্রশ্ন ওঠে।

কোনো লোকের শেষ মূল্য—ultimate value—নির্ণয় করতে হ'লে দেখতে হবে সে কী হ'য়ে উঠল—what he becomes: বেশ কথা। কেবল এক্ষেত্রে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—একজন কী হ'য়ে উঠছে বা উঠল তা কী ক'রে বোঝা যাবে? কী উপায়ে জানব সে কোন্ স্তরে রয়েছে?

কেবল কি নিছক অনুভূতির আলোতেই এটা দেখা যায়, না কল্পনাকে ডাক দিতে হয়? কিম্বা তার "হ'য়ে-ওঠার"—becoming-এর—কোনো বাহ্য প্রকাশ থেকে নিগূঢ় তত্ত্বটি অনুমান ক'রে নিতে হবে? একজন "যা-হ'য়ে-উঠল" তার সঙ্গে কি সে "যা-বলছে" "যা-করছে" তার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না? এক কথায়, রামশ্যামের কথাবার্তা বা কার্যকলাপ সব বাদ দিয়ে কি তাদের মূল্যনির্ধারণ সম্ভব? অন্তর্দৃষ্টির কথা ছেড়ে দিচ্ছি এই জন্যে—যে সাধারণ মানুষের নেই এ-সম্পদ। তারা কী ক'রে কোন্ সূত্র ধ'রে পৌঁছবে অপরের আত্ম-রূপান্তরের রহস্যলোকে? ইতি

শ্রীঅ—

শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম, পণ্ডিচেরি ২০. ৮. ৩৮

শ্রীঅ— করকমলেষু

কিছুদিন আগে—এক বৎসরের কাছাকাছি হবে—জহরলাল সম্বন্ধে আমি যে-প্রবন্ধটি ভারতবর্ষে লিখি আপনি নিশ্চয় তাতেই শ্রীঅরবিন্দের ঐ উক্তিটি পড়েছেন যে, মানুষের সত্য মূল্য ও শেষ পরিচিতি তার কথায় নয়, এমন কি কাজেও না—তার স্বরূপের যাচাই হ'ল সে কী হ'য়ে উঠল সেই পরখে।

কথাটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমারো ভালো লাগল: আরো এইজন্যে যে আধুনিক কর্মঘর্ঘর বিজ্ঞাপন-মুখর যুগে এ-পরখের সত্যতা নিত্যই অস্বীকৃত হচ্ছে। মানুষকে আজকের দিনে পনের আনা ক্ষেত্রে সম্মান দেওয়া হয় তার কথা ও কাজ মেপেজুপে। এর মধ্যে একটা বেদনা আছে। সে-বেদনা মানুষের অন্তরাত্মার। কবি ব্রাউ-নিঙের একটি কবিতার কয়েকটি চরণে এর রেশ উঠেছিল বেজে:

Not on the vulgar mass
Called work must sentence pass
Things done that took the eye and had the price,
O'er which from level stand,
The low world laid its hand,
Found straightway, to its mind, could value in a trice.
But all the world's coarse thumb
And finger failed to plumb
So passed in making up the main account:
All instincts immature.
All purposes unsure,
That weighed not as his work, yet swelled
the man's amount:
Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and escaped

All I could never be
All men ignored in me
This was I worth to God, whose wheel
the pitcher shaped.

অনামীতে এর আমি বাংলা করেছি—শেষ স্তবকের—

যত চিন্তা গহন মূর্ছনা
সীমাক্ষুণ্ণ কর্মে বাজিল না
উধাও কল্পনা—মর-ভাষা যার পেল না সন্ধান :
যত ফুল মনে ফুটিল না
নিখিল ফিরিয়া চাহিল না
তারি গন্ধমূল্যে মোর নিখিলেশ-নয়নে সম্মান।

আপনি যে-প্রশ্ন তুলেছেন তার গোড়াকার কথাটা হ'ল এই গন্ধমূল্যের মর্যাদা-বিচার। প্রশ্ন কঠিন বৈ কি—বুদ্ধির দিক দিয়ে নাগাল পেতে গেলে। অথচ আমাদের গভীর অনুভবলোকে ঋষির এ-উক্তি, কবির এ-আক্ষেপ যে আলোয় আলোময় হ'য়ে ওঠে একথা অপ্রতিবাদ্য। না উঠলে যুগে যুগে ধ্যানীর, তত্ত্বদর্শীর, ঋষির চরণ-তীর্থে মানুষ "প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" সত্য-সন্ধানে যেত কি?

সেদিন আমার এক আত্মীয় এই শ্রেণীর এক প্রশ্ন তুলে আমাকে এম্‌নিই মুস্কিলে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল : যুগ যুগ ধ'রে যোগী ঋষি তো এতশত এলেন গেলেন—কিন্তু হ'ল কী? তাঁর ভাবখানা : "কর্মী বৈজ্ঞানিক বণিক এঁদের কাজে ভালো হোক মন্দ হোক একটা কিছু ঘটছে, কী না দৃশ্যজগতে প্রত্যক্ষ

পট-পরিবর্তন, ধরা-ছোঁয়া-যায়-এমনতর বিপ্লবাদির রকমফের অভিনীত হচ্ছে—কিন্তু দ্রষ্টা মুনি ঋষি এঁদের আবির্ভাবে কই তেমনতর কোনো ফল তো হাতে-হাতে ফলছে না? মিলছে না তো হাতে-হাতে নগদ বিদায়!"

উপনিষদে বলেছে পনের আনা লোকের চেতনা বহির্মুখী—ক্বচিৎ দু-একজন দেখা যায় যাঁরা অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরান।* কাজেই এ দুচারজন ছাড়া কারুর চোখেই বড় একটা পড়ে না—আন্তর অঘটনের প্রত্যক্ষ বিপ্লবগুলির ছবি। এই জন্যেই ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী ৺লোয়েস ডিকিন্সন তাঁর শেষ জীবনে খেদ করেছিলেন যে, "Nothing that is important can be proved."

বহির্মুখী মন, আত্মম্ভরী প্রাণ চলে পাল তুলে বাইরের উজান টানে। হাজার পাদপ্রদীপের আলোয় হাজার মানুষের নটলীলায় যে-শোরগোল ওঠে সে-সব খতিয়ে প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর (unimportant) হ'লেও তাদের ফলাফল যে চাক্ষুষ করা যায় একথার মার নেই। তাদেরকে সপ্রমাণ করা যায়: চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় যে তারা এল ও কুরুক্ষেত্র ঘটিয়ে

* পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠোপনিষৎ)

ভাবার্থ:—আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার খোলে বাইরের দিকে সহজে, এই-ই বিধাতার বিধান। তবে এক আধজন ধ্যানীর দৃষ্টি বাহিরে না তাকিয়ে অন্তরের দিকে তাকায় অমৃতকামী হ'য়ে, আমাদের আত্মিক সত্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁরাই।

তবে গেল—প্রায়ই। কিন্তু বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য কবীর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দর মত মহামানবদের আবির্ভাবে যে বিপ্লব ঘটে সে মানুষের গহন অন্তরলোকে। সেখানকার বার্তা অনুভবগ্রাহ্য, শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মানুষের আত্মিক সব অঘটন—মিরাক্লের বেলায়ই এই কথা। তারা অনুভবগম্য, সাধনলভ্য, সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য—কিন্তু যুক্তিতর্কে নিষ্পন্ন হয় না, হ'তে পারে না।

মানুষের "হ'য়ে ওঠা" হ'ল এই অতীন্দ্রিয় লোকের অঘটন—মিরাক্ল। তার বলা-কওয়া চলা-ফেরা ধরা-ছোঁওয়া সবই হ'ল বাইরের ঘটনা—phenomena: এদের বাটখারা আছে, নিক্তি আছে—গজকাঠি দিয়ে মাপলে মেলে এদের নাগাল। কিন্তু আন্তর অনুভবের পরখ করতে হবে অন্য গজকাঠি দিয়ে—কষতে হবে অনুভবের কষ্টিপাথরে, তবে মিলবে তার হদিশ। শ্রীঅরবিন্দ ও ব্রাউনিং এই কথাই বলেছেন—কেন না একথা তাঁরা অনুভব করেছেন তাঁদের চেতনার মর্মকোষে। সেখানকার বাণী হ'ল অপরোক্ষ অনুভবের বাণী—তার মর্মজ্ঞ হ'তে হ'লে সে রাজ্যের বাসিন্দা হ'তে হবে—তার দর্শন পেতে হ'লে চাই তৃতীয় নয়ন—দিব্যদৃষ্টি, নইলে তাদের যাথাতথ্য সম্বন্ধে যতই হাঁকডাক করুন না কেন, দেখবেন বেশির-ভাগ লোকই মেনে নিতে পারবে না—যেহেতু বেশির-ভাগ-লোকের চেতনা (উপনিষদের ভাষায়) বহির্মুখী।

কিন্তু তা ব'লে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে অনুভবের গহনলোকে যে-সত্য ফুটে ওঠে বহির্লোকে তার কোনো ছোঁয়াচই লাগে না। তা যদি হ'ত, তাহ'লে জৈবলীলা হ'য়ে দাঁড়াত

একটা অর্থহীন অসংবদ্ধ অবিন্যস্ত ঘটনাস্রোত। অতীন্দ্রিয় লোকের অনুভব-দীপ্তির ছোপ বহির্লোকের ঘটনায় প্রায়ই লাগে—নিরন্তরই বাইরের সঙ্গে ভিতরের চলেছে মালাবদল। যেখানে ভিতরের আলো ফোটেনি সেখানে বাইরেটাও হয় হীনপ্রভ। একই কথা দুজনের মুখে ফুটে ওঠে: একজনের মুখে তা শোনায় ছায়ার-ছায়া, অন্যজনের মুখে—আলোর-আলো। বিলাসী পলিটিকাল বক্তা বললেন—"ত্যাগ করো"—লোকে হেসে উঠল: সর্বত্যাগী মার্টার বললেন—"ত্যাগ করো"—ছুটল লোক দলে দলে ঘর ছেড়ে। জীবনের এ-রহস্য সবাইকারই চোখে পড়ে—পার্সনালিটির রহস্য। এর নিদান বুদ্ধির কাছে অজ্ঞেয়। একজনের মধ্যে ফোটে অনির্ণেয় আকর্ষণী শক্তি—অন্যের মধ্যে ফোটে না। কেন? না, একজন এমন কিছু একটা হয়েছে—(তা সে প্রাক্তনবশেই হোক বা সাধনবলেই হোক)—যা অন্যজনা হয় নি। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণিকে—"কর্তার চাপ্‌রাশ পেয়েছ? নৈলে শুনবে কে তোমার কথা?" চাপরাশ হ'ল এই হ'য়ে-ওঠা—জীবন-সাধনায় ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ পাওয়া—তা সে-সাধনা যেদিকেই হোক না কেন। আসল কথা তাই এই হ'য়ে-ওঠা নিয়ে।

এর পরের কথা—আপনার পরের প্রশ্ন—আরো কঠিন। কী ক'রে বুঝব কে কী হ'ল, কতখানি হল, কারুর আন্তর পরিণতির বাহ্য প্রকাশ দিয়ে তাকে কতখানি বোঝা সম্ভব ইত্যাদি। এক কথায়, আপনি প্রশ্ন তুলেছেন—কী ভাবে মানুষের আন্তর পরিণতি ও বিকাশ বাইরে সক্রিয় হয়।

এ-কথার সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া কঠিন আরো এই জন্যে যে মানুষের চরিত্র বিচিত্র, প্রকাশভঙ্গি ততোধিক। কেউ কথায় নিজের অনুভবকে বাইরে সংক্রমিত করতে পারে, কেউ বা লেখায়, কেউ বা গানে, কেউ বা রূপরেখায়। এ-সব অবশ্য কর্মের— what he does-এর কোঠায় পড়ে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যেটা প্রণিধানযোগ্য সেটা হল এই বিচিত্র সত্য—যে এ-সব কর্মের মধ্যে দিয়ে কর্মকর্তার আন্তর অনুভব কোনো না কোনো উপায়ে সক্রিয় হ'লেও তার সমগ্র মূল্য—তার সত্তার মূল্য—এ-সবকেও ছাপিয়ে যায়। এই যে surplus—যাকে না মেলে তার বচনে, না কর্মে, না শিল্পে, না প্রতিভায়, অথচ যার প্রভাব জীবনের উপর কাজ করে এক রহস্যময় অনির্ণেয় ভঙ্গীতে—কী ক'রে করব তার মাপজোপ? একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—তাহ'লে হয়ত আমার বক্তব্যটা একটু প্রাঞ্জলতর হ'তেও পারে—যদিও (পুনরুক্তি মার্জনীয়) এ-ধরণের বক্তব্য মূলত অনুভবগ্রাহ্য ব'লে খুব সুবোধ্য ক'রে বলা কঠিন।

ধরুন একজন বড় গায়কের গান বা বড় চিত্রীর চিত্র। এমন দেখা যায় যে, সে গান কেউ হুবহু নকল করতে পারল, সে-চিত্রের হুবহু কপিও করল আর কেউ। কিন্তু মূল গান বা মূল চিত্রের সমকক্ষ হ'তে পারল না—এ নকল গান, নকল ছবি। কেন এমন হয়? দেখানো যেতে পারে—গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে—যে মূল গানের সঙ্গে নকল গানের ভঙ্গি ছন্দ কম্পন সংখ্যার তফাৎ নেই একটুও—অণুবীক্ষণ বা ফটোগ্রাফের সাহায্যে

প্রমাণ করা যেতেও হয়ত পারে যে, মূল চিত্রের সঙ্গে নকল চিত্রের মিল নিখুঁৎ। অথচ তবু বিশেষজ্ঞরা সবাই মানবেন যে এ-দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান-জমিন। হ'তেই হবে। আর এ-হওয়ার কারণ ঐ অব্যক্ত অনির্বচনীয় অপ্রকাশ্য মানুষটির ছোঁয়াচ। বড় গায়কের গানে বড় শিল্পীর শিল্পে তাঁর পার্সনালিটির ব্যক্তিস্বরূপের ছোঁয়াচ লাগল—না লেগেই পারে না—ছোট গায়কের ছোট শিল্পীর নকলের চারদিকে নেই এ-জ্যোতির্মণ্ডল। বড় শিল্পী যা হ'য়ে উঠেছেন ছোট শিল্পী তা তো হ'য়ে উঠতে পারেন নি। সুতরাং—

মানুব এ-ও খানিকটা বাহ্য বিচার বৈ কি। কেন না এরও মূল লক্ষ্য হ'ল কৃতকর্মের ওরফে কীর্তির সমগ্র বিচার— হোক না এ বিচারভঙ্গি অন্তর্মুখী, তবু একে কীর্তির বিচারই বলতে হবে—যেহেতু গোটা মানুষটার বিচার না হ'লেও তার প্রভাবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূল্যই এখানে কষা হ'ল। এরও "পরে" আছে। কিন্তু তার কথা যুক্তি-বোধ্য ক'রে প্রকাশ করা আরও কঠিন। তবু একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করব।

কি জানেন? লৌকিক বিচার হাজার সূক্ষ্মদর্শী মনের বিচার হ'লেও সে কখনই ইন্দ্রিয়কে পেরিয়ে যেতে পারে না। এই জন্যেই মনকেও আমাদের দার্শনিকেরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন। কেন না মনও কোনো না কোনো প্রকাশকে আঁকড়ে তবে পায় অকূলে কূল। কিন্তু পরমার্থ হ'ল মনের এলাকার বাইরে—সে যে অতীন্দ্রিয়। মানুষের বেলায়ও একথা খাটে, কেন না পরমতম যে, সর্বাধার যে—

সে রইল "জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। তাই মানুষ যে-অনুপাতে এই ভাগবত চেতনার সত্তা পাবে সে অনুপাতে যাবেই মনের এলাকা পেরিয়ে—না গিয়ে পারে না। এই জন্যেই বলেছে: None but Christ has ever understood Christ: এ-কথার তাৎপর্য এই যে খৃষ্টকে পুরো বুঝতে হ'লে তাঁর চেতনার সালোক্য পেতে হবে... অন্য ভাষায়, হ'তে হবে নিজেও খৃষ্ট—to become Christ.

এই জন্যে সব আধ্যাত্মিক সাধনারই শেষ কথা হ'ল হওয়া, হ'য়ে-ওঠা—পাওয়া নয়। একথা সত্য যে কর্মের মধ্যে দিয়েই এই হ'য়ে-ওঠার সন্ধান মেলে, কিন্তু তাই ব'লে একথা সত্য নয় যে কীর্তির বাটখারায় কর্তার ওজন সম্ভবপর। কেন না হ'য়ে-ওঠার নিগূঢ়তম প্রভাব ফলে তো বুদ্ধিগ্রাহ্য পথে নয়: ফলে—অনুভবলোকে, সাক্ষাৎ ছোঁয়াচে। এই জন্যে প্রেমেরও সুরু ইন্দ্রিয়লোকে বটে কিন্তু সারা—ঐ অতীন্দ্রিয় অনুভবলোকে—যেখানে এক সত্তার মিলন হয় আর এক সত্তার সঙ্গে, ফলে "দুই মিলাইয়া এক অঙ্গ হয়"। এ-মিলন কী বস্তু তা প্রকাশনীয় নয়—হ'তে পারে না—অথচ এর চেয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব অপরোক্ষ অনুভূতি আর কিছু নেই—তাই প্রেম বলুন, ভালোবাসা বলুন, দরদ বলুন, sympathy বলুন—এর যে নামই দিন না কেন—এই আন্তর উপলব্ধির, realisation-এর স্বীকার না হ'লে কিছুই কৃতার্থ হয় না। এই জন্যেই ভগবান গীতায় বলেছেন: কৃচ্ছ্র দান তপস্যা কিছুতেই তাঁকে মেলে না, মেলে কেবল ভক্তিতে প্রেমে—"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোর্জুন, জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" ভক্তিতে শুধু যে তাঁকে জানা

বা দেখা যায় তাই নয়—তাঁর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এই-ই হ'ল হ'য়ে-ওঠা—to become. কোন্ কীর্তি দিয়ে একে মেপে পাবেন বলুন—কোন্ বচন দিয়ে পাবেন এই আত্মরূপান্তরের রাজ গুহ্যরস—রহস্যমুত্তমম্? কোন্ প্রকাশে এ পুরো ধরা দেয়? দিতে কি পারে? মানুষ মানুষকে তার মহার্ঘতম অর্ঘ দেয় যে-নৈঃশব্দ্যের নিস্তরঙ্গে—যেখান থেকে "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—কাঙাল বচন মন দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

আপনি হয়ত বলবেন যে এ-ধরণের কথা একটু যেন ধোঁয়াটে গোছের। বললে খুব ভুল বলবেন না হয়ত, কেবল একটা কথা মনে রাখতে হবে: যে, জ্ঞানের বাণী হ'ল ঊর্ধ্বচেতনার বাণী, কাজেই নিম্নচেতনার আধারে তাকে ঢালতে গেলে তার কিছুটা উপছে পড়ে—পড়বেই। ফলে হয় এই যে জ্ঞানের অনেকখানি নিহিতার্থ ফস্কে যায়। এই জন্যেই জ্ঞানের পরম বাণী, পরম আলো অর্ধজ্ঞানের রাজ্যে একটু আবছামতন হ'য়ে আসে—যুক্তিপ্রাঞ্জল, সুবোধ্য, সম্পূর্ণ মনে হয় না। কী ভাবে ঝাপসা ঠেকে একটু বলি শ্রীঅরবিন্দেরই আর একটি বাণী উদ্ধৃত ক'রে।

তাঁর Life Divine-এর The Divine and the Undivine অধ্যায়ে জ্ঞানচিন্তামণি লিখেছেন: (২য় খণ্ড—১৭০ পৃষ্ঠা):

For without experience of pain we would not get all the infinite value of the divine delight of which pain is in travail; all ignorance is a penumbra which environs an orb of knowledge, every error is

significant of the possiblity and the effort of a discovery of truth ; every weakness and failure is a first sounding of gulfs of power and potentiality ; all division is intended to enrich by an experience of various sweetness of unification the joy of realised unity.

ভাবার্থ

বিনা ব্যথা-উপলব্ধি পরমানন্দের অন্তহারা
মহিমার মর্ম কে জেনেছে—যে-আনন্দ চিরধারা,
ব্যথার দুলাল ? জ্ঞান—জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যমণি :
অজ্ঞান উপান্তে তারি কাঁপে আধ-আলোচ্ছায়াধ্বনি।
ভ্রান্তি কারে বলে ? সে যে পুরোহিত—সত্যসাধনার :
আসন্ন যে-আবির্ভাব—তারি প্রত্যূষের অঙ্গীকার।
ক্লৈব্যে, পরাজয়ে জাগে আদিমন্ত্র অতল শক্তির
গূঢ় ওঙ্কারের : চির-অগ্রদূত সে—পরিণতির।
বিচ্ছেদ নিয়ত সাধে লাবণ্যের বিচিত্র উচ্ছ্বাসে
উল্লাসের উলুধ্বনি—মিলনের সম্ভোগবিলাসে।

বলতে চান কি এ-ধরণের জ্ঞানমন্ত্রের মর্মপরিগ্রহ করা সহজ ব্যাপার ? না, টলষ্টয়ের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলবেন যে, যে-বাণী এখনি এখনি সর্বজনবোধ্য নয় সে নামঞ্জুর ?

হয়েছে কি, আমরা অষ্টপ্রহর বাস করি তেল-নুন-লকড়ির রাজ্যে —ইন্দ্রিয়ের হাজারো মুখর দাবি-দাওয়া মেনে। কাজেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সত্যকেই বলি বাস্তব, বাকি সবকে মনে করি স্রেফ্ কবিত্ব

বা কল্পনা বা দুর্বোধ্য সুতরাং অকেজো। কিন্তু চেতনার আরোহণ বিনা পারমার্থিক তত্ত্ব বোঝা অসম্ভব—"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্"—অবিকশিত বালমনে পরমতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না—বহু সাধনায় তবে উর্ধ্বলোকের পানে রুদ্ধ হৃদয়ের বাতায়ন খোলা যায়। আর যতক্ষণ খোলা না যায় ততক্ষণ হাজার 'ধর্মের কাহিনী' বলা হোক না কেন কূপমণ্ডুক মন চোরা শোনে না—মাথা নেড়ে বলে—ও সব আকাশকুসুম অবাস্তব—একমাত্র কূপের বদ্ধ সত্যই হ'ল বাস্তব। তাই সুবোধ্য দুর্বোধ্যের তর্ক রেখে বলব শুধু আর একটি কথা—শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কেই। তাঁর কথাই ফের তুলছি এই জন্যে যে আপনার মূল প্রশ্নটি তাঁরই একটি উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে: যে, "হ'য়ে-ওঠা" বলতে কী বোঝায়? এ-কথার উত্তর দিতে হ'লে শ্রীঅরবিন্দের ভাব-ধারার একটু খবর রাখতেই হবে—যেহেতু "হ'য়ে-ওঠার" এ-বাণীটি হচ্ছে তাঁর সাধনার একটি অতি মূল্যবান বাণী—যার পরম পরিণতি হ'ল শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায়, "complete transformation of human nature and consciousness", কি না, মানব-প্রকৃতি তথা চেতনার আমূল রূপান্তর। অবশ্য এ-প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনার স্থান এ নয়—আমি কেবল একটু আভাষ দেবার চেষ্টা পাব—কোন্ পথে তাঁর এ-ধরণের মূলসূত্রের ভাষ্য খুঁজতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবরাজ্যে যদি একটু প্রবেশ করেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন তিনি প্রায়ই ব'লে থাকেন যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মানস-বিশ্লেষণ পরায়ণতার দরকার থাকলেও আমাদের চেতনার

বিকাশ-পথে সব চেয়ে বড় সহায় হ'ল আমাদের অন্তরের দিশা, উপলব্ধির বর্তিকা। আমাকে ১৯৩৫ সালে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"অন্তরের দিশা সক্রিয় হ'য়ে আমাদেরকে চালাবে এই দিকেই আমার মনের সব চেয়ে জোরালো সায়" ("I have such a strong penchant for the inner working!") অন্তর্মুখিতার দিকে এ-ভাবে জোর দিয়েছেন তিনি বরাবরই। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেব শুধু : Life Divine-এর ৮৯৫ পাতায় তিনি লিখছেন : "It is only by an inner realisation...by an overwhelming experience or by many experiences building up an inner change, by a transmutation of the consciousness, by a liberation of the spirit from its present veil of mind, life and body that there can emerge the spiritual being." এর ভাবার্থ এই যে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ হ'তে পারে শুধু আন্তর অনুভবের মধ্যে দিয়ে, উপলব্ধির ভূমিকম্পের মধ্যে দিয়ে, চেতনার রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে, দেহপ্রাণমনের বর্তমান আড়াল থেকে আমাদের আত্মার উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ এত বেশি জোর দেন জ্ঞানের আলোর 'পরে।

কেবল এখানে একটা কথা ভুলবেন না : জ্ঞান বলতে শ্রীঅরবিন্দ য়ুরোপীয় বুদ্ধিবাদী দার্শনিক কচকচি বা বৈজ্ঞানিক থিওরির শিশুপাঠ বোঝেন না, বোঝেন যা বুঝতেন প্রাচীন ঋষিরা, সাধকেরা, দ্রষ্টারা : কি না—spiritual experience—

অধ্যাত্ম উপলব্ধি। তাঁর Life Divine-এর "The Methods of Vedantic Knowledge" অধ্যায়ে এ-কথাটি তিনি বিশদ ক'রে বলেছেন : দেখিয়েছেন (পৃ: ১০৪—১০৫, প্রথম খণ্ড) যে,

"The sages of the Veda and Vedanta relied entirely upon intuition and spiritual experience" (বেদ বেদান্তের ঋষিদের একমাত্র উপজীব্য ছিল অধ্যাত্ম উপলব্ধি)। তাই—বলছেন তিনি—আজকালকার পণ্ডিতেরা প্রায়ই ভুল করেন যখন তাঁরা উপনিষদের তর্ক ও বিচারের কথা বলেন বড় গলা ক'রে। কারণ—ভাষ্য দিচ্ছেন তিনি—বৈদিক যুগে যে সব তর্কাতর্কি হ'ত তাকে বাগ্বিতণ্ডা বললে ভুল হবে—সে সব ছিল আসলে পরস্পরের উপলব্ধির খবর নেওয়া, আমি কি "জেনেছি" তার সঙ্গে তুমি যা "জেনেছ" সেটা মিলিয়ে নেওয়া, খুঁটিয়ে দেখা। তাই সে সময়ে একজন জ্ঞানী আর একজনকে প্রশ্ন করতেন না—"তোমার কী মনে হয়?" প্রশ্ন করতেন: "তুমি কী জানো?" উপনিষদের কোথাও যুক্তিতর্কের আমেজ পাওয়া যায় না—যার জোরে বৈদান্তিক সত্যকে মঞ্জুর করা হ'ল। (The question asked by one thinker of another is "What dost thou know?"—not "What dost thou think?"—nor "To what conclusion has thy reasoning arrived." Nowhere in the Upanishads do we find any trace of logical reasoning urged in support of the truths of the Vedanta. Intuition, the

sages seem to have held, must be corrected by a more perfect intuition ; logical reasoning cannot be its judge.)

এই সব উপলব্ধিই হ'ল শ্রীঅরবিন্দের কাছে সব চেয়ে বড় কথা—কারণ এদের মধ্যে দিয়েই মানুষ "হ'য়ে-ওঠে"—ঘটায় প্রকৃতির রূপান্তর। তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—(আমার "সূর্যমুখী" বইটির ৪১৬ পাতায় পাবেন পুরো পত্রটি) যে আজকের দিনে আনুষ্ঠানিক ধর্ম যে একটু সেকেলে মতন হ'য়ে পড়েছে তার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে ধর্মের মধ্যে মানুষ যেন একটা অসম্পূর্ণতা ও অসমগ্রতার আভাস পেতে শুরু করেছে। তাই তিনি বলছেন "all religions are a little off-colour now." অর্থাৎ, সব ধর্মই কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে পড়েছে। কেন এমন হ'ল তার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন এই ব'লে যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে দিয়ে যে-ধরণের আশ্রয় পাওয়া যায় মানুষের অন্তরাত্মা আজ তার চেয়ে বৃহত্তর আত্ম-উন্মোচন চাইছে যাতে ক'রে সে পায় এমন কোনো অনাগত আলো যাকে তার মন ও হৃদয় সরলরেখায় অনুসরণ করতে পারে। ("It may be the sense of something inadequate or incomplete in the religion itself—the need of a larger opening of the soul into the Light that is being felt, an opening through which the expanding human mind and heart can follow.")

একথা তিনি বারবারই বলেছেন। বলেছেন কেন? না, আনুষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয় হ'ল ক্রিয়াকাণ্ড—মানে বহির্মুখী ক্রিয়াকাণ্ড। কিন্তু মানুষ যে অধ্যাত্ম আলো চায় সে-আলো হ'ল স্বভাব-অন্তর্মুখী, যার ভাঙচুরে, রসায়নে, কলাকৌশলে ঘটে—প্রথম, অন্তরলোকের রূপান্তর, পরে প্রাণমনের রূপান্তর, সবশেষে দেহের। কি না, যা ছিল না তাই হ'য়ে উঠল। কাজেই দেখছেন তাঁর রূপান্তরের দীক্ষা হ'ল খতিয়ে এই হ'য়ে-ওঠারই দীক্ষা। মানুষ বিশ্বলীলায়—চা'ক বা না চা'ক—নিরন্তরই হ'য়ে উঠছে ব'লেই হচ্ছে তার ক্রমপ্রগতি, এ-ও শ্রীঅরবিন্দ বারবারই বলছেন (যার বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল ইভল্যুশন) যেমন ধরুন তাঁর Life Divine-এর ৮৩৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন: "It cannot truly be said that there has been no such thing as human progress since man's appearance or even in his recent ascertainable history; for however great the ancients···there has been in later developments an increasing subtlety, complexity, manifold development of knowledge and possibility in man's achievements, in his politics, society, life, science, metaphysics, knowledge of all kinds art, literature." আর শুধু যে বহির্জীবনেই এ প্রগতির চিহ্ন দেখা যায়, তা-ই নয়, তার অধ্যাত্মজীবনেও প্রগতি হচ্ছে বৈকি: "Even in his spiritual endeavour,"—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—"less surprisingly lofty and less massive in

power of spirituality than that of the ancients, there has been this increasing subtlety, plasticity, sounding of depths, extension of seeking." অর্থাৎ, "মানুষের আদিম অভ্যুদয়ের যুগ থেকে—কিংবা হাল আমলের নির্ণীত ইতিহাসে—তার যে কোনো প্রগতিই হয় নি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। প্রাচীনরা যত বড়ই হোন না কেন, তাঁদের পরবর্তী যুগের বিকাশে মানুষের রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সর্ববিধ শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে বেড়েছে বই কি তার নানামুখী জ্ঞান ও কীর্তির সম্ভাবনা, এমন কি, তার আধ্যাত্মিক অধ্যবসায়েও সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, নিবিড়তার দিশা তথা সন্ধানের পরিধিও প্রবর্ধমান।"

এসব এত ক'রে বলছি কেন না এ-ও হ'ল সেই হ'য়ে-ওঠারই ব্যাপার, দেখছেন তো? বিশ্বলীলায় এই রূপান্তরের যুগান্তর চলেছে আবহমানকাল—এই স্তরে স্তরে সাজসজ্জা—প্রসাধন-অনুভবের পট-পরিবর্তন: জড় বাস্তব জীবন থেকে প্রাণধর্মী জীবন, প্রাণধর্মী জীবন থেকে মনোময় জীবন, মনোময় জীবন থেকে অধ্যাত্ম জীবন—ধাপে ধাপে জীব উঠছে চেতনার আরোহণী বেয়ে যুগে যুগে, দেশে দেশে, কালে কালে। কিন্তু হ'লে হবে কি, মানুষের দৃষ্টি স্বভাব-বহির্মুখী, তাই সে সাজসজ্জার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভুল ক'রে ভেবে বসে যে এ-ই বুঝি আসল কথা, বাইরের এই সব প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপীঠ কুচ্‌কাওয়াজের ধুমধড়াক্কার দরুণই বুঝি মানুষ বদ্‌লাচ্ছে। কিন্তু তা হয় না—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—কেননা

বাইরের তোড়জোড় বদ্‌লে মানুষের আন্তর চেতনার রূপান্তর হ'তে পারে না—এর জন্যে চাই অধ্যাত্ম-শক্তির আবাহন—আত্মিক চিৎপদ্মের মুঞ্জরণ। কেন না আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ যদি না হয় তাহ'লে তার সত্তার কোনো গভীর স্থায়ী রূপান্তর হ'তেই পারে না। তাই তাঁর Life Divine-এ যুগর্ষি আমাদেরকে দিয়েছেন সেই দীক্ষা যা মানব প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এ-রূপান্তর না ঘটলে—বলছেন তিনি—মানব-জীবনের বা সমাজের কোনো স্থায়ী উন্নতি চাওয়াটাই হ'য়ে দাঁড়ায় অযৌক্তিক তথা অনাধ্যাত্মিক : "For to hope for a true change of human life without a change of human nature is an irrational and unspiritual proposition ; it is to ask for something unnatural and unreal, an impossible miracle." ওদেশে এই জনশ্রুতি বহুদিন ধ'রে র'টে আসছে বটে যে শিক্ষায় হ'তেপারে চতুর্বর্গ লাভ কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে তাও হবার নয়—কেন না "মানুষ মনে মনে যত আশাই কেন না পোষণ ক'রে থাকুক—কার্যক্ষেত্রে এসে সে ঠেকে ও ঠ'কে শিখেছে যে শুধু শিক্ষা ও বুদ্ধির প্রসাধনের জোরে পারে না নিজের ভোল বদল করতে—এসবের ফলে শুধু তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মাভিমান খবর রাখে বেশি আর আত্মপ্রতিষ্ঠার তরফে হাতের কাছে জোয়ালো যন্ত্রপাতি পায় বেশি--কিন্তু তার মানবিক অহংকারের কোনো পরিবর্তনই হয় না।" (১১৬৬ পৃষ্ঠা)

কাজেই দেখছেন যে হ'য়ে-ওঠা যে আসল কথা এটা অন্য নানা দিক থেকে ভাবলেও সঙ্গতই মনে হয়, যদিও নিছক

যুক্তি দিয়ে এ হ'য়ে-ওঠার অন্তর্গূঢ় রহস্যের দিশা মেলে না পুরোপুরি।

কিন্তু তবু যুগে যুগে জীব চেয়েছে এই আত্মরূপান্তরই বটে। জলালুদ্দিন রুমির একটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত ক'রেই আজ ইতি টানব : লক্ষ্য করবেন যে এখানে কবি ও মনীষী উভয়েরই বাণী দীক্ষা ও দৃষ্টি একই :—

ধাতুর জীবন ত্যজি' জাগিলাম সবুজের শোভাযাত্রায়,
শ্যামল-কান্তি বিদায়ে বিহগ-জীবনে জনম মিলেছে।
লভেছি চেতন ধীরে ধীরে নর-জীবনের প্রেমবার্তায় :
তবে কেন ডরি ?—মৃত্যু বিকাশে মোর কবে বাধা দিয়েছে ?
তবু আরবার এ-মোর ধন্য মানবের দেহ মরণে
হব দেবদূত-সাথী : পরে যাব তারো সীমান্ত তরিয়া
আমি অনন্ত-উধাও পান্থ—চিরন্তনের চরণে
আপনা হারায়ে হব চিন্ময় অচিন্ত্য লীলা বরিয়া।

প্রেমী

শ্রীপ্রমোদ কুমার সেন

করকমলেষু,

আপনার "শ্রীঅরবিন্দ" বইটি পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল বিখ্যাত ফরাসি চিন্তানায়ক পল ভালেরির একটি সুন্দর কথা। কথাটি তিনি লিখেছিলেন একটি চৈনিক লেখকের বইয়ের ভূমিকায়: "Elle me fait songer a l'aurore, au phénomène rose qui, par ses tendres nuances, insinue et annonce l'immense evenement de la naissance d'un jour."

"বইটি তোমার দেয় করিয়ে মনে
উষার কথা নরম সোনার প্রথম জাগরণে,
রবির উদয় হয় নি যখন আকাশে
জাগে যে-সব রঙ অচিনের আভাষে:
অনাগতের আবাহনের সুর ধরে চারণী
দীপ্তদিনের জন্মযুগের গাইতে আগমনী।"

আপনার বইটি পড়তে পড়তে সত্যিই আমার মনে হয়েছে একথা: মনে হয়েছে যে, এ-বইটির সুর হ'ল চারণীর সুর, আগমনীর সুর---আর সে-আগমনী এমন একজন যুগাবতারের যাঁর প্রেমের জ্ঞানের কর্মের আলোর পথ চেয়ে রয়েছে মানুষ অনেকদিন ধ'রে।

কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-যুগ হ'ল আসলে বৈশ্যযুগ— যার আব-হাওয়ায় সবচেয়ে বেশি কাটে দুরকম বই: চটকদার ও সাময়িক

কৌতূহলোদ্দীপক। কেন না এই দ্বিবিধ বইয়েরই বাজার-দর বেশি। তাই শোনা যায় প্রায়ই অমুক অমুক বইয়ের কাটতি হ'ল অসম্ভব কিন্তু ঐ একটি ঋতুর মধ্যে। সীসন্ বদলাতে না বদলাতে ফুল শুধু যে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল তাই নয়—ঝ'রে গেল চিরদিনের মতনই। কিংবা এদের উপমা দেওয়া যেতে পারে সেই শ্রেণীর প্রজাপতিদের সঙ্গে যারা ঝক্মক্ ক'রে চম্‌কে দেয় বটে—কেবল একটি বেলার জন্যে।

কিন্তু দুর্দিনের বুকেই সুদিনের পূর্বাভাষ। ভালোরির কথা সত্য : দীপ্ত দিন আগে জানান দেয় "নরম সোনার প্রথম জাগরণে।" আপনার বইটি পড়তে পড়তে একথা উপলব্ধি করা যায় যেন নতুন ক'রে : আরো আনন্দ হয় ভাবতে যে এ-যুগেও এমন বই কালেভদ্রে বেরোয় যাদের উদ্দেশ্য নয় কোনো ঋতুরঞ্জন ক'রেই ক্ষান্ত থাকা, যাদের উদ্ভব হৃদয়ের গভীর আনন্দ শ্রদ্ধার উৎসমূলে। এ শ্রেণীর বই ক্ষণজীবী নয়। এদের কাটতি কম হতে পারে কিন্তু আবেদন দীর্ঘজীবী। এদের সম্বন্ধেই মনে পড়ে গীতার "ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ" বনস্পতির কথা—

স্বপন-নভে উৎস যার—ধরণীতলে আনে
অলকা-আলো-করুণা ভালোবাসার কলতানে।

আপনার বই এই জাতের। তাই মনে ভরসা হয় এ বই লেখার জন্যে আপনাকে তারা অন্তত অভিনন্দন করবে যারা এখনও বিশ্বাস করে যে মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশ হ'ল ঐ ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের মতন : জীবনের প্রতি মহৎ বিকাশের মূলাধার মাটিতে হ'লেও তার প্রেরণা নামে আকাশ থেকেই। তাই তো বলছিলাম :

এ-বইটি বিশেষ ক'রেই সময়োপযোগী হয়েছে আজকের দিনে যখন সব চিরন্তন সত্যসাধনা গগনতৃষা শিখরস্বপ্ন শুধু অনাদৃত নয়— উপহসিত, যখন ব্যঙ্গের পিঙ্গল শরজালে সব বড় সাধনা তপস্যা নিষ্ঠার বর্ণরাগই লুপ্তপ্রায়—যখন হিংসার কুরুক্ষেত্রে প্রেমের, মৈত্রীর, ত্যাগের বাণীকে অলীক বলেই মনে হয় শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের কাছে। মনে পড়ে এক বান্ধবীর কথা। সে আজ সতেরো বছরের কথা—প্রাগে তখন আমি তাঁর অতিথি। তিনি কাউন্টেস্-দুহিতা—কিন্তু আদর্শবাদী ছিলেন স্বভাবে : তাই বিবাহ করেছিলেন এক দরিদ্র সৈনিককে। বলেছিলেন আমাকে : "দিলীপ! য়ুরোপের বাইরের সাজসজ্জা দেখে আজ তোমাদের অনেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে য়ুরোপ যে কী অসুখী জানো না। আমাদের শৈশবেও গুরুজনেরা আমাদের মনের মাটিতে এমন অনেক বিশ্বাসের আবাদ করতে পেরেছিলেন যার ফসল ফলেছিল পরে আমাদের যৌবনে। কারণ, এসব বিশ্বাসে তাঁদের যে-আস্থা ছিল, যে-নির্ভর ছিল, তার অনামা ভরসা আমাদের মনে চারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা কী একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করো। আমরা আজ যেন কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আর। ঈশ্বর পরলোক স্বর্গ এসব তো বরখাস্ত হয়ে গেছে কবে। কিন্তু তাতেও খেদ থাকত না যদি ওদের এমন কোনো বদ্‌লি পেতাম যার কোলে অন্তরাত্মা আশ্রয় পায়। আমাদের বিশ্বাসের বনেদে ধরেছে ফাটল। এখন দাঁড়াই কোথায় বলো দেখি?" আমি (ঠাট্টার উদ্দেশ্যে নয় প্রথম যৌবনের সরল উৎসাহেই)

বলেছিলাম : "কেন ? আপনাদের কল্পতরু বিজ্ঞানের বৈকুণ্ঠে ভর ক'রে ?" উত্তরে তিনি ম্লান হেসে বলেছিলেন : "বিজ্ঞান দিয়েছে আমাদের অনেক কিছু মানি। কিন্তু যতই তার গুণ গাও না কেন, বিজ্ঞানের এলাকা বৈকুণ্ঠ নয়—মাটিই বটে। মানুষ মাটি বিনা বাঁচতে পারে না এ-ও সত্য, কিন্তু মাটি যার সর্বস্ব তার আখের মাটি। বিজ্ঞান যতই জ্ঞান জ্ঞান ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক না কেন—এ-জ্ঞান পরম জ্ঞান নয়, হ'তে পারে না, কেন না ওর পথের পাথেয় হ'ল ইহসর্বস্বতা। কিন্তু Man does not live by bread alone (মানুষ অন্নসর্বস্ব নয়) খৃষ্টদেবের একথার মার নেই।"

অনস্বীকার্য, সন্দেহ কি ? কিন্তু হ'লে হবে কি, এযুগে এহেন কথা বলতে সাহস পান যে দু'চারজন বরেণ্য মানুষ তাঁরা সংখ্যায় এত কম যে ইহ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন না কিছুতেই। পারবেন কী করে ? অতীন্দ্রিয়ের তপস্যা তো দূরের কথা, অন্তরের শাশ্বত চিরস্বীকৃত ব্যাপক উপলব্ধিদের মধ্যেও কয়টি আজও আদৃত বলুন দেখি ? অত কথায় কাজ কি, সদা সত্য কথা বলা উচিত এ রাজি-নামায় সই দিতে ক'জন রাজি ? সম্প্রতি পড়ছিলাম পোলাণ্ডের সেদিন-কার অধিনায়ক পিলসুডস্কির কথা। রাজসভায় তিনি অস্বীকার করেন শত্রুপক্ষের কোনো রটনা, বলেন এসব মিথ্যা রটাচ্ছে শুধু পোলাণ্ডের শত্রুরা। কিছুদিন বাদে তিনিও পোলাণ্ডের অধিনায়কত্ব ত্যাগ করেন। তারপর সেই সভাতে গিয়েই নির্লজ্জ দম্ভের সুরে বলেন: "বন্ধুগণ ! সেদিন আমি মিথ্যা বলেছিলাম, কেন না সেদিন ছিলাম আমি দেশের প্রতিনিধি—সমষ্টির হিতসাধন যার মন্ত্র। কিন্তু আজ

আমি একটি সাধারণ নাগরিক, কাজেই সত্য বলতে পারি— আমাদের বিরুদ্ধে যে কথা রটেছিল তা মিথ্যা ছিল না, আমার প্রতিবাদটাই ছিল মিথ্যা। * অর্থাৎ থিওরিতে সত্যকে যতই বড়ো বলো না কেন কার্যক্ষেত্রে উনি হলেন অচল টাকা আর কি।

এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন এ-ধরণের কথার পিছনকার 'সিনিক' মনোবৃত্তি। এ-বৃত্তি আজ কত ব্যাপক কত প্রবল সেটা দেখাতে য়ুরোপের একজন মস্ত মানুষের আত্মজীবনীর কথা পাড়ি। আরো এইজন্যে যে এ বইটি যেন আরো উজ্জ্বল ক'রে দেখায়, কিছুদিন আগেও কী ধরণের প্রশ্ন জাগত য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনে। এই ধরণের মনই আজ বিরল হয়ে আসছে, বলেছিলেন বান্ধবী।

বইটি হল হ্যাভেলক এলিসের। আপনি জানেন তিনি শুধু একজন মস্ত যৌনতাত্ত্বিক পণ্ডিতই ছিলেন না—ছিলেন ওদেশের একজন মস্ত মানুষ—মনীষী, শিল্পী, প্রেমিক। ইনি সেদিন মারা গেছেন। তারপরে এঁর লেখা আত্মজীবনী বেরোয় যেটি ইনি সমাপ্ত ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। ইনি বলছেন বইটির ভূমিকায় :

আজ বার্ধক্যের উপান্তে এসে আমি না-চাইতে পাচ্ছি যে-প্রীতি, ভক্তি, পূজা তাতে আমার মাথা নুয়ে পড়েছে শুধু দীনতায় নয়—এ-গরিমার শঙ্কায়। বহু নিষ্ফলতার ভিত্তির উপরেই

* "Gentlemen," he said, "the other day I lied to you. I was a public character and I had to lie. Now I am a private individual and I can tell you the truth. I did engineer the Vilna coup. Gentlemen, good morning !" (Chapter 32, Inside Europe—Gunther)

সাফল্যের সৌধ গ'ড়ে ওঠে। তার কাছে পরাভব কোথায় যে পরাভবকে আমলই দিল না? প্রেম ও সরলতার সম্পদ হৃদয়ে বরণ ক'রে চললে এ-জীবনের যা-কিছু ছোঁও না কেন দেখবে ভাস্বর সুষমায় ঝল্‌কে উঠল।" ব'লে শেষটায় লিখছেন: "I have been a dreamer and an artist, a great dreamer—for that is easy, not a great artist—for that is hard, but still always an artist, whether in the minor art of writing, or the greater art of comprehending, or the supreme art of living, wherein it is something to have tried even if one fails. So that if I am often sad—for the art of living is finally the art of loving in which one becomes a master too late—I am always content. For I have always been instinctively attracted to what is difficult, even in my relations with those I have loved."

("আমি চিরদিনই স্বপনী তথা আর্টিষ্ট—হয় লেখার ম'ত ছোট আর্টে, নয় বোঝার বা বাঁচার ম'ত বড় আর্টে, যে-রাজ্যে ব্যর্থ হ'লেও চেষ্টা সার্থক। তাই যদিও অনেক সময়েই আমার মন বিষাদে ছেয়ে আসে—কেন না বাঁচার আর্ট খতিয়ে দাঁড়ায় প্রেমেরই আর্ট যার অধিকারী হয় মানুষ সবশেষে—তবু আমি কখনই বলি না নিজেকে অকৃতার্থ। কারণ আমার প্রকৃতির চিরকালের ঝোঁক দুরায়ত্তের দিকে—এমন কি যাদের আমি ভালোবেসেছি তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানেও।"

হঠাৎ একথাগুলি উদ্ধৃত করলাম এই জন্যে যে এই art of loving আজ শুধু য়ুরোপে নয় জগতের সর্বত্রই হ'য়ে উঠেছে "দুরায়ত্ত"। হওয়ার একটা কারণ এই যে সত্যিকার প্রেম মুখে বলা যত সহজ জীবনে উপলব্ধি করা ঠিক তত সহজ নয়। সহজ হ'ত যদি না মানুষ আজো অন্ধভাবে বলত, যদি সে আত্মবিকাশের জন্যে সচেতন ভাবে উর্ধ্বশক্তির কাছে হাত পাততে শিখত। কিন্তু মানুষ এযুগে বড় বেশি বহির্মুখী, বড় বেশি হাত পাতে বাইরের কাছে—সঙ্ঘের কাছে, সমাজের কাছে, যূথবদ্ধ মানুষের মুগ্ধ লুব্ধ মনের বিধিবিধানের কাছে। তাই যেটুকু আলো তার অন্তরে ফুটতে চাইছে, ম্লান হ'য়ে আসছে অন্তরের খোরাক না পেয়ে। আমার ঐ বান্ধবী একথাটি সুন্দর ক'রে বলেছেন সম্প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘপত্রে, এই কুরুক্ষেত্র বাধবার কয়েক মাস আগে। লিখছেন তিনি ;

"অনেকে বলেন যে এখনকার মন্ত্র হল—প্রত্যেকের সামনে যে-কর্তব্য রয়েছে করা (Que chacun fasse pour le mieux son travail) প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ ক'রে নিজের নিজের বিবেককে মেনে সমাজের ঋণ শুধুক (Que chacun s'acquitte conscienceusement de sa tache). কিন্তু হ'লে হবে কি, এ ভাবের বাণী আমাদের মনকে সেই সব ভ্রান্তিবিলাস থেকে মুক্তি দিতে অক্ষম যারা আমাদের অভ্যাসে, কর্মে, স্বভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাই তো এত চোখে পড়ে আমাদের বিবেকের দৈনন্দিন পঙ্গুতা, অথচ অন্ধের মতন গড্ডালিকা-প্রবাহে

গা ভাসান দিয়ে আমরা মনকে প্রবোধ দিই যে, কর্তব্য করা হচ্ছে যথাযথ!"

আক্ষেপটি মনে আরো বেজে ওঠে আপনার বইটির প্রসঙ্গে কারণ আপনার লেখায় আপনি নানাভাবেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এই ট্রাজিডির কথা—বিশেষ ক'রে সপ্তদশ অধ্যায়ে যেখানে আপনি শ্রীঅরবিন্দের নির্ণীত সভ্যতার বিবর্তন ধারার কথা বলেছেন। এইজন্যেই আরো মনে হয় আপনার বইটির আবির্ভাব হয়েছে যথা সময়ে।

আরো একটি কারণে আপনার বইটি আমার ভালো লেগেছে। সেটি হচ্ছে এই যে বোধকরি এ-যুগে আপনিই সবপ্রথম খানিকটা চেষ্টা করেছেন শ্রীঅরবিন্দের যোগারূঢ় সিংহাসনের মহিমা আঁকতে তাঁর সমগ্র জীবনের পটভূমিকায়। কথাটা একটু খুলে বলা মন্দ নয়।

অনেক দিন আগে দেখতাম—যে-কথা 'তীর্থঙ্করে' বলবার চেষ্টা করেছি, যদিও সংক্ষেপে লিখতে হয়েছে ব'লে হয়ত ঠিক মতন বলা হয় নি—শ্রীঅরবিন্দকে আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই শ্রদ্ধা করতেন জাতীয়তার পুরোহিত হিসেবে। কিন্তু তাঁর যোগিরূপকে বেশি শ্রদ্ধা করতে দেখেছিলাম মাত্র একজন বন্ধুকে : সে বিদেশী—কৃষ্ণ-প্রেম ওরফে রোনাল্ড নিক্সন। গত কয় বছরে বাংলাদেশে আমাকে কয়েকবার ফিরতে হয়েছিল আপনি জানেন। এখন হাওয়া একটু ফিরেছে এ-ও চোখে পড়েছিল—অন্তত দু'চারজনও তো ভাবতে সুরু করেছেন শ্রীঅরবিন্দের যোগটা কি বস্তু—পেতে শোয়, না গায়ে দেয়? কিন্তু এমন বন্ধু খুব কমই পেয়েছি যিনি

সত্যি ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দের অমৃতসাধনার গুহ্য মহিমা। তাই আপনার বইটিতে আপনি যে অন্তত উল্লেখ করেছেন এ-মহিমার কথা—যে-মহিমার স্থান তাঁর বিকাশের শিখরলোকে—এজন্যে আপনাকে সাধুবাদ দিতেই হয়। কেন না শ্রীঅরবিন্দকে কবি, বিদ্বান, চারণ এমন কি দার্শনিক ব'লে সম্মান করাটাও আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। শ্রীমাও একদিন বলেছিলেন একথা যে শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে হ'লে তাঁর কৃতিত্বের বিচারই যথেষ্ট নয়—সব আগে চাই আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া—নইলে তাঁকে আমরা শুধু যে অবান্তর কারণে বড় বলব তাই নয়—বড় করতে গিয়েই করব ছোট। কথাটা গভীর—যদিও এ বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগে আধ্যাত্মিক চেতনার গুণগান করাটা দুঃসাহসিক হ'য়ে উঠেছে। তবু বলতেই হবে যে চেতনার ক্রমবিকাশ মানসলোকেই সমাপ্ত হয় নি—হ'তে পারে না, কেন না আধ্যাত্মিক চেতনাই হ'ল মানুষের মুকুটমণি, যোগলব্ধ অমৃত-পাথেয়।

আমাদের বুদ্ধিবাদী বন্ধুদের অধিকাংশ অবশ্যই এ-কথার প্রতিবাদ করবেন। তাঁদের কাছে বরেণ্য হ'ল মানস চিন্তার উপাসকেরা—'ইনটেলেকচুয়াল' যাদের নাম। কিন্তু মনকেও আমাদের ঋষিরা বলতেন ইন্দ্রিয়—যেহেতু সেও আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়—অনেক কিছুর বাহন। মনে আছে, শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে প্রথম প্রথম কেবলই ঘা খেতে হ'ত—কেন না বুদ্ধির অহংকার হ'ল—'মরিয়া না মরে রাম'—বার বার ঠেকবে তবু শিখবে না—ছুটবে অনধিকার চর্চায়। আপনার বইটির নানা স্থানে ইঙ্গিত আছে মানস আলো কেন আমাদের

খানিকদূর এগিয়ে দেবার পরে আর এগিয়ে দিতে পারে না। কেন এখন বুদ্ধিকে ক্রমশ মানতেই হবে যে, তার সাম্রাজ্যও চালায় বুদ্ধির উপরওয়ালা কোনো শক্তি। আর মানতে হবে ব'লেই শ্রীঅরবিন্দকে দার্শনিক ব'লে শ্রদ্ধা জানানোটাও সর্বতোভাবে অসম্পূর্ণ, একদেশ-দর্শী—যেহেতু তাঁর মূলমন্ত্র তো দার্শনিক নয়—আধ্যাত্মিক ও মানসা-তীত। এ আধ্যাত্মিক-অতিমানস দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তিনি কী বোঝেন সেটা প্রাঞ্জল ক'রে বোঝানো সহজ নয় এইজন্যে যে এ-যুগের অধিকাংশই (বিশেষ ক'রে বুদ্ধিবাদীরা) শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়:

'We are blind with our pride
and the pomp of our passions,
We are bound in our thoughts
where we hold ourselves free.

মোদের মত্ত গরব আড়ম্বরে মুগ্ধ দু নয়ান
বাঁধি চিন্তা সসীম দিয়ে মোরা মুক্ত আপনায়।

আরো একটা কারণে আপনার বইটি আদরণীয় হবে তাঁদের কাছে যাঁরা বুদ্ধির অকৃতার্থ জোনাকিপনায় তুষ্ট নন। আপনি নানা স্থানেই আভাষ দিয়েছেন যে শ্রীঅরবিন্দ তথাকথিত "intellectual" নন—এমন কি দার্শনিকও না। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে নিজেই ঈষদ্ধাস্য ক'রে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "I never never never was a philosopher". একথার মানে নয় অবশ্য যে, শ্রীঅরবিন্দ ফিল-সফির বেসাতি করেন নি। (নিছক ফিলসফির জন্যেই যাঁদের ক্ষুধা, তাঁর দর্শনে তাঁদেরও ভূরি-ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে অঢেল)

একথার মানে এই যে, শ্রীঅরবিন্দের কেন্দ্রীয় চেতনা এই সব তথাকথিত বুদ্ধিবিচারের বিতণ্ডালোকে সংবদ্ধ নয়—তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত এ-সবের বহু উর্ধ্বে, তাই তিনি তাঁর ফিলসফিরও প্রেরণা পেয়েছেন বুদ্ধির চেয়ে ঢের উর্ধ্বলোক থেকে।

কিন্তু ঠিক এই কারণেই বহু লোকের কাছে আপনার বইটি শুধু ব্যর্থ নয়—প্রায় অর্থহীনের সামিল মনে হবে: অর্থাৎ তাঁদের কাছে যাঁরা (পরমহংসদেবের ভাষায়) পোয়াটেক মনের বাটিতে মাপতে যান মণখানেক দুধ। এই ধরণের বুদ্ধিবাদীরা কেমন ক'রে বুঝবেন বলুন যে, শ্রীঅরবিন্দের উপাস্য হ'ল সেই জ্ঞান, সেই সত্তা, সেই আদর্শ যা মনের বুদ্ধির নাগালের বাইরে তো বটেই কল্পনারও বাইরে। কেমন ক'রে মেনে নেবেন যে তাঁকে বুঝবার কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়-স্বচ্ছন্দ পথই নেই—কেবল একটিমাত্র পথ আছে—ক্রমাগত বার বার নানাসূত্রে উপলব্ধি করা কেন, কি কারণে, মনের কোন্ কোন্ অন্ধকারের দরুন তাঁর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের মহত্ত্ব আমাদের চোখে পড়ে না। উপনিষদ বলেছে: "যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"—অর্থাৎ যে ভাবে তাঁকে জেনেছে সেই জানল না, যে জেনেছে যে সে জানে নি সে তবু কতক জানল। শ্রীঅরবিন্দের মহিমা সম্বন্ধেও একথা স্বীকার করা অসম্ভব হবে না যদি আমরা নম্রভাবে এটুকু উপলব্ধি করার কিনারায় আসি যে, চেতনার যে-দীপ্তলোকে তাঁর বসবাস সে লোকের কোনো খোঁজ খবরই আমরা রাখি না।

শ্রীঅরবিন্দকে জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব একথা আপনার বইটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। এই জন্যেই বইটি আমার

আরো ভালো লেগেছে। আপনি ভূমিকায় ঠিকই বলেছেন: "এক তিনিই তাঁহার কথা বলিতে পারেন।"

কিন্তু তবু আমি বলব যে আপনার বইটির দরকার ছিল। কী তুচ্ছতার কলঙ্ক যে আমরা সগৌরবে দিনের পর দিন ব'য়ে বেড়াই: রোগে কেঁদে মরি, শোকে নুয়ে পড়ি, বিরহে ব্যথিয়ে উঠি, নিরাশায় ধুলোয় লুটাই, পদে পদে ভয় কার্পণ্য লালসাকে আঁকড়ে চলি অথচ মুখে বলি—আমরা জনে জনে সত্যের চরম সাধক, অমৃতের পরম পূজারী—এসবই আপনার বইটির পাতায় পাতায় আরো আলো ক'রে ফুটে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের দীপ্যমান্ পটভূমিকায়। তাঁর ত্যাগ, নির্ভীকতা, ভাগবত-ভাবুকতার পাশে আমাদের স্বার্থ, শঙ্কা, একান্ত ঐহিকতার ছবি যেন আরও ধিক্কার দিতে থাকে আমাদের তামসিকতাকে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনের উজ্জ্বলতার এ পরম রূপ ফুটল কোথায় এইটে জানা সবচেয়ে কঠিন ব'লেই জীবনীকারের দায়িত্ব আরো বেশি এইটে দেখিয়ে দেওয়ার। রাম শ্যাম যদু হরি হৈ চৈ করতে পারে ছোটকে বড়র মূল্য দিয়ে, বলতে পারে দেশভক্ত শ্রীঅরবিন্দই হচ্ছেন তাঁর ব্যক্তিরূপের পূর্ণতম মহত্তম অভিব্যক্তি, কিন্তু জীবনীকারকে ভাঙতেই হবে স্বল্পদৃষ্টি মানুষের এ-ঠিকে-ভুল। তাঁকে দেখাতেই হবে যে শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব তাঁর দেশাত্মবোধে অঙ্কুরিত হলেও প্রস্ফুটিত হয়েছে পরে—তাঁর যোগজীবনে। কারণ একথা না মানলে শ্রীঅরবিন্দের মহত্তম মহিমাই ঝাপসা থেকে যাবে—তাঁর পরমতম বাণীই থেকে যাবে অনাদৃত। অথচ এযুগে সাধারণ

বাঙালির (তথা ভারতীয়ের) এই দিগ্‌ভ্রমই ঘটেছে। ঘটবেই, কেন না সংসারে সাড়ে পনের আনা মানুষ যখন বহির্মুখী তখন সবার কাছে কী করে পরিবেশন করা যাবে অন্তর্মুখিতার আনন্দ-সম্পদ ? শুধু ভাষার অক্ষমতাই তো নয়, ধারণাশক্তির দুর্বলতা যে ঢের বেশি ব্যাপক, আর ব্যাপক বলেই না সাংঘাতিক !

তবু জীবনের মহিমা দুর্বোধ্য। কখন যে কোন্ ছোঁওয়ায় মনের প্রাণের অন্তরের কোন্ পরীমহল খুলে গিয়ে উদ্‌ঘাটিত করে অনন্ত সৌন্দর্যের দৃশ্য কেউ কি জানে ? তাই পরমহংসদেব বলতেন —ভালো কথা না বুঝলেও শুনে রাখা ভালো, পরে কাজ হয় সময়ে, যেমন এক বাড়ির কার্নিশে বীজ উড়ে পড়েছিল, অনেকদিন বাদে বাড়িটি পড়ে গেল, তখন সেই বীজ হ'ল বনস্পতি। সত্য। ভালো কথা যে আলোর সংঘাত, তার ফলে কোথাও না কোথাও আমাদের অজ্ঞাতে স্পন্দন না জেগে পারে ? অবশ্য এ ধাক্কার ফলে গভীরে যে-সব নড়চড় হয় তার হদিশ সব সময়ে তখনি তখনি মেলে না কিন্তু পরে যখন হঠাৎ একদিন আসে বিপ্লবের ওলট পালট, দুর্যোগের বিপর্যয়, তখন এ আলোর আবেগও সঞ্চিত জলপ্রপাতের মতন বাঁধ ভেঙে সক্রিয় হয় আচম্বিতে। এই জন্যে সব দেশেই আধ্যাত্মিকতার একটা মস্ত কথা হ'ল যাকে আমরা বলি 'আপ্তবাক্য', গ্রীকরা বলতেন 'Logos', খৃষ্টানরা বলেন 'the Word'—আর তার চেয়েও বড় কথা—সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ বলতে সব সময়ে সাধু-সান্নিধ্য বোঝায় না—বোঝায় ভক্তির প্রণালী দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ। আপনার বইটির মধ্যে দিয়ে এই যোগ আরো

সহজে হয়, কেন না শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। "He who would make us feel must feel it most."—কোনো ভাব চারিয়ে দিতে পারে সে-ই যে সে ভাবের ভাবুক: জীবনের প্রতি পদেই মেলে একথার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। তাই তো আপনার ভক্তিশ্রদ্ধার আবেশে জাগে ভক্তি শ্রদ্ধা, যেমন প্রাণের আবেগে জাগে প্রাণাবেগ, গতির আবেগে—গতিনৃত্য।

কেবল একটা কথা আমার সময়ে সময়ে মনে হয়—যদিও এর কোনো চারা নেই— যে, আপনার বইটি যেমন অনেককে গভীর আনন্দ দেবে, তেমনি অনেককে উত্যক্ত ক'রে তুলবে—বিশেষ ক'রে তাঁদেরকে যাঁরা চেতনার ঊর্ধ্বলোকে ওঠার সাধনা না ক'রেই বুঝতে চাইবেন তার তত্ত্ব, করতে ছুটবেন তার যাচাই। এ-সূত্রে একটা কথা মনে হ'ল।

আমার মনে আছে একবার আপনি আমাকে একটি পত্রে প্রশ্ন করেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব করুণাকে মৈত্রীকে প্রেমকেও কেন লোকে এত ভুল বোঝে—কেন এত বেশি লোকে অকারণে তাঁর সাধনার বিরোধী, আশ্রমের নিন্দাবাদী?

এর মানে আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে দেবতার সঙ্গে দানবও আছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবদ্রোহিতা—কম আর বেশি। যাঁদের মধ্যে দেবভাব বেশি—অর্থাৎ যাঁরা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ—তাঁরা বেশি সহজে গ্রহণ করতে পারেন নিষ্কামনার বাণী, নিতে পারেন এ-নিরভিমান প্রণতির দীক্ষা। কিন্তু এ-প্রকৃতির লোক তো সুলভ নয়। বিশেষত এযুগে—যখন অধিকাংশের মধ্যেই

আনুগত্যের চেয়ে ঔদ্ধত্যই বেশি প্রবল। এ-ঔদ্ধত্য, এ-দেবদ্রোহিতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় আরো ব্যাপক হয়েছে, যার ফলে এমন কি বুদ্ধিজগতের বালখিল্যদের মধ্যেও দেখেছি প্রশ্নহীন আত্মতুষ্ট অন্ধ অহমিকা অথচ তারা একে অহমিকা ব'লে চিনতেই শিখল না, ভাবল—সত্যনিষ্ঠা। এরা পদে পদে চায় নিজেদের তুচ্ছতার রাজ্যকে—আঁধারের অন্ধকূপকে আলোর আক্রমণ থেকে আগলে রাখতে। ভোগে যারা আসক্ত তারাই ত্যাগের কথায় ডরিয়ে ওঠে—যা বুঝি না তা যে বোধগম্য বস্তুর চেয়েও বড় একথা স্বীকার করতে বাজবে না?

তাছাড়া দেখবেন সাধারণত আমাদের এই দেবদ্রোহিতার পিছনে থাকে একটা আত্মরক্ষার ভাব—self-preservation জাতীয় ত্রস্ত মনোভঙ্গি। থাকবে না কেন বলুন? আঁধারে বাস ক'রে ক'রে সেই আঁধারই যাদের আত্মীয় হয়ে এসেছে—হঠাৎ অনভ্যস্ত সত্যের অনাত্মীয় আলো দেখলে তারা যে—

"ভাবে একী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তার ওঠে ওরা রেগে
শয়ন ছেড়ে আসে ছুটে বেগে
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।"

এই জাতীয় সব আঁধার শক্তিসৈন্যদেরকেই শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন hostile forcess (মার বা আসুরশক্তি)। অসুর বলতে দশানন কুম্ভকর্ণ বা শুম্ভনিশুম্ভদেরকে বোঝায় না, বোঝায়

দেবদ্রোহী মিথ্যা-শক্তির চক্রীদেরকে। বলেছি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে এই সব চক্রীর চক্রান্ত—কেবল কম আর বেশি। কিন্তু যাদের মধ্যে এদের সংখ্যাপ্রাধান্য তারা কোথাও দৈবী শক্তি দেখলেই নানা অছিলায় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে ওরা ভুয়ো—ভ্রান্তি-বিলাস **hallucination** ইত্যাদি। চরম মাত্রায় এদের রূপ হয় ভয়াবহ—যখন প্রশ্রয় পেতে পেতে এরা হয়ে ওঠে উচ্চণ্ড দানব—মেদবৃদ্ধির ভারে হয়ে ওঠে হিংস্র অতিকায় রাক্ষস, ঘাতক। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি না ক'রে যখন এরা ছদ্মবেশে হানা দেয় তখন এরা প্রকৃতপক্ষে আরো বিপজ্জনক হ'লেও বাইরে থেকে দেখতে ততটা দানবিক হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু সেটা শুধু স্পর্ধার অক্ষমতায়—ইচ্ছার অভাবে নয়। পারলে এরা কংসের মতনই প্রতি কৃষ্ণভক্তের হাতে মাথা কাটত, কিন্তু খোলাখুলি অতটা চণ্ডমূর্তি হওয়াও সহজ কথা নয়। কাজেই আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোমুখি হ'লে এরা আশ্রয় নেয় হাজারো ছলনা বঞ্চনা চাতুরীর—যার একটা ভোল হল যুক্তি। এ-যুক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বাক্‌মায়ায় প্রমাণ করবার চেষ্টা পায় যে প্রেম মৈত্রী শান্তি বৈরাগ্য অনাসক্তি এরাই ভ্রান্ত, সংসারে সার হ'ল সঞ্চয় সাবধানতা স্বার্থসিদ্ধি গতিবেগ ও উদ্দাম মত্ততা। কাজেই সত্যসাধকগণ যখন তাঁদের দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সত্যের স্বরূপ ফলাও ক'রে ধরেন তাঁদের জীবনগ্রন্থে, তখন রুখে ওঠে এই সব অসত্যপন্থী বা অর্ধসত্যপন্থীর দল, বলে: চিরন্তন বাণী সবই মিথ্যা, দেবতা—কুসংস্কার, প্রেম—দুর্বলতা, অনাসক্তি—ইহবিমুখতা, শান্তিসাধনা—জীবনের রণে ভঙ্গ দেওয়া,

যার আধুনিক নামকরণ হয়েছে পলায়নী-বৃত্তি—escapism. আরও কত যুক্তি ইঙ্গিত ব্যঙ্গ দিয়ে যে এরা শাশ্বত সত্যকে খর্ব করার চেষ্টা করে না জানে কে? তাই জগতের দিকে চেয়ে মানুষের অন্তরাত্মা আবহমান কাল গেয়ে এসেছে :

"বিশ্বময় দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ :
পুণ্য সেনা নিজের কর্ পাপের সেনা শত্রু হোক।"

গীতায়ও বলেছে এই সব অসত্যচমূর কথা :

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥

অর্থাৎ, দম্ভ ও অহংকারবশে রিপুচালিত হ'য়ে যে অল্পবুদ্ধিরা দেহাধিষ্ঠিত ভগবানের অমর্যাদা ক'রে মহোদ্যমে শক্তিমদের উপাসনায় তপস্যা করে তাদেরই নাম অসুর জানবে।

আজকের দিনে অনেক আত্মম্ভরী রাষ্ট্রনীতিক পেশীবন্ত তথা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমন্তদের সঙ্গে গীতোক্ত অসুরদের সংজ্ঞা যে মিলে যায় সেটা আশা করি আপনিও অনুভব করেছেন? গীতায় বলছে "দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ" অধ্যায়ে যে "এই সব অসুরেরা এ জগৎকে বলে অনীশ্বর কামজ-মিলন-জাত জীবদের লীলাভূমি, চায় শত কামনার পাশবদ্ধ হ'য়ে কাড়াকাড়ি ক'রে বাঁচতে, অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় ক'রে কামক্রোধের খেলার পুতুল হ'য়ে কাল কাটাতে, ঘোষণা করে আজ আমি এই ধন পেয়েছি কাল পাব অন্য

অনেক ধনকে, অমুক অমুক শত্রুকে বধ করেছি অমুক অমুককে বধ করলাম ব'লে, কেননা ঈশ্বর তো আমিই, ভোগী সিদ্ধ বলবান্ সুখী আমি ছাড়া আর কে? আমার মতন ধনাঢ্য ও কুলীনই বা আর কোন্ জন?"—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥

* * *

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।

* * *

এই সব আসুরিক মিথ্যার বাধাদেরকে লক্ষ্য ক'রেই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন :

"If I tolerate a little writing about myself, it is only to have a sufficient counter-weight in that amorphous chaos, the public mind, to balance the hostility that is always aroused by the presence of a new dynamic Truth in this world of Ignorance."

অর্থাৎ, আমি নিজের সম্বন্ধে যে একটু আধটু লেখালিখি ক'য়ে থাকি সেটা শুধু এই জন্যে যে গণমনের মধ্যে কোনো নবসত্যের অভ্যুদয়ে বিরুদ্ধতা জেগে ওঠেই, তাই তার উল্টোদিকে একটুখানি আনুকূল্যের শক্তি বজায় রাখা চাই, গণমন যে আসলে একটি বৈশিষ্ট্যহীন বিশৃঙ্খলতার নৈরাজ্য কিনা। কিন্তু হ'লে হবে কি, বিশৃঙ্খলতার, অরাজকতারও একটা বিষম মাধ্যাকর্ষণ আছে। তাই তো সত্যসাধকদেরকে সর্বদেশে সর্বকালে আরো সংঘবদ্ধ হ'তে হ'ল, এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুকেও বরণ ক'রে তবে সত্যের পথ সুগম করতে হ'ল পরবর্তীদের জন্যে। এই জন্যেই তো তাঁদের আঁধার-রাজ্যে তুলতে হ'ল আলোকস্তম্ভ, বহির্মুখী উত্তেজনার কুরুক্ষেত্রে রচতে হ'ল অন্তর্জ্যোতির দুর্গ। একথা শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর Life Divine-এর উনশেষ অধ্যায়ে (The Gnostic Being ১০৪৫ পৃষ্ঠা) :

"In all spiritual living the inner life is the thing of first importance ; the spiritual man lives always within, and in a world of the Ignorance that refuses to change he has to be in a certain sense separate from it and to guard his inner life against the intrusion and influence of the darker forces of the Ignorance : he is out of the world even when he is within it ; if he acts upon it, it is from the fortress of his inner spiritual being where in the inmost

sanctuary he is one with the Supreme Existence or the soul and God are alone together."

অর্থাৎ, "সর্ববিধ অধ্যাত্মজীবনে অন্তর্জীবনই হ'ল মুখ্য কথা; আধ্যাত্মিক মানুষ সর্বদা অন্তর্মুখী জীবনই যাপন ক'রে থাকেন এবং যে-অজ্ঞানের জগৎ চায় না জ্ঞানের রূপান্তর সে-জগতে তাঁকে একরকম একঘরে হ'য়েই বাস করতে হয় যাতে ক'রে তিনি অজ্ঞানের কৃষ্ণশক্তিচমূর অনধিকার প্রবেশ ও প্রভাব থেকে পারেন নিজের অন্তর্জীবনকে রক্ষা করতে: তাই যখন তিনি এজগতের মধ্যে থাকেন তখনও একরকম বাইরে বাইরেই থাকেন বৈকি; যদি এ-জগতে তিনি কাজ করেনও, করতে বাধ্য হন তাঁর অন্তরের অধ্যাত্ম সত্তার দুর্গ থেকে, যেখানে গহনতম মন্দিরে তিনি বিশ্বাত্মার সালোক্য-লাভে আপ্তকাম, যেখানে জীব ও শিব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।"

শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্জীবনের পরম বাণী বুঝতে হ'লে সব আগে চাই তাঁর সত্যসাধনার এই বাণীটি ধরতে পারা। এর পরেও তাঁর বলবার অনেক কিছুই আছে, ক'রে দেখাবারও। যেমন ধরুন তাঁর অতিমানসতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যা—যেখানে তিনি বলছেন যে অতি-মানস শক্তির অবতরণ হ'লে অধ্যাত্মসাধকদেরকে আর এভাবে নিরালায় থাকতে হবে না—বহির্মুখী জীবনে তারা ঢের বেশি সহজে নিজেদের ঠাঁই ক'রে নিতে পারবে ইত্যাদি। কিন্তু সেসবের আভাস দেওয়াও এ-ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভব নয়। আমার বক্তব্য আজ এই যে শ্রীঅরবিন্দের পরম মহিমা বুঝতে হ'লে তাঁর অন্তর্জীবনকে না জানলেই নয়।

একথা বলছি আরো এই জন্যে যে তাঁর ঊর্ধ্বমুখী ও অন্তর্মুখী জীবনে পারমার্থিক সত্য কি ভাবে অনুসৃত হয়েছে আপনি আপনার বইটিতে তার বেশ আভাস দিয়েছেন যদিও এ-আভাস ঈষদাভাসের বেশি হ'তে পারে না, কেননা তিনি যে-ক্রমবর্ধমান সংঘাতরাজ্যের যুগাবতার হ'য়েছেন তাঁর অসাধ্য-সাধনার প্রাণ-পণে, সে-সাধনার রহস্য কতটুকু উদ্‌ঘাটন করা যায় বলুন ছুটো ভাষার ব্যাখ্যায়? তাঁকে পুরোপুরি বোঝা তো দূরের কথা তাঁর বিস্তীর্ণ আলোকরাজ্যের তাম্বূলকরঙ্কবাহী হ'তে চাইলেও আগে হ'তে হবে তাঁর ভাবের ভাবুক—তিনি যে-সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন চাইতে হবে সে-সত্যের আবাহন—চিন্তা-সাধনায়, ক্রিয়াকলাপে, যাগযজ্ঞে। এই আত্মোৎসর্গ যত সম্পূর্ণ হবে ততই বোঝা যাবে যে শ্রীঅরবিন্দ এ-যুগে শুধু সত্যজ্ঞানঘন মূর্ত বিগ্রহ নন তিনি প্রেমেরও ভগীরথ হ'য়ে তপস্যা করেছেন এই নিষ্করুণ নিরালোক বাসনাপঙ্কিল মর্ত্যভূমিতে, প্রেমের আকাশগঙ্গাকেই ডাক দিতে। একথা বলছি আরো এই জন্যে যে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে জ্ঞানের উজ্জ্বল দিকটা অনেকেরই চোখে পড়ে, কিন্তু তিনি যে প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ একথা বুঝতে হ'লে শুধু তাঁর বহির্জীবনের খবর রাখা যথেষ্ট নয়—হ'তে হবে তাঁর অন্তর্জীবনের আলোক-জিজ্ঞাসু। তাহ'লেই বুঝতে পারা যাবে—তাঁর দেশাত্মবোধে তাঁর আশ্চর্য ত্যাগ ও প্রেমের যে-প্রতিভাদীপ্তি এক সময়ে সারা ভারতের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সে-প্রেম কেন পরমতম বিকাশ লাভ করতে পারত না, যদি তিনি দেশ-সেবায়ই

চিরদিন নিমগ্ন থাকতেন অধ্যাত্মসাধনার ডাক না শুনে—যদি তাঁর অতুলনীয় আত্মবিলুপ্তির ভাব না পৌঁছত পুরুষোত্তমের চরণে, যাঁর সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখেছেন তাঁর অপরূপ "Who" কবিতায় :

All music is only the sound of His laughter
All beauty the smile of His passionate bliss
Our lives are His heart-beats ; our rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our love is their kiss.

বাজে যেথায় যত গান সবই তাঁর হাসি কলোচ্ছল
সব মাধুরী তাঁর আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ ;
মোদের জীবন হৃদিস্পন্দন তাঁর, পুলক—সে কেবল
বাসর রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের—তাঁদেরি চুম্বন।

এক বিজ্ঞ স্কলার কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানের আলোকস্তম্ভ হ'তে পারেন কিন্তু প্রেমের রাজ্যের কঞ্চিও নন। তাঁকে দোষ দিই না। মনে পড়ে গীতার কথা :

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ

অজ্ঞানাবৃত মানুষ দুঃখ তো পাবেই—এ-পণ্ডিতটি জ্ঞানী নন কাজেই তাঁর পুঁথিপড়া বিদ্যার মাপজোপে ঠিকে ভুল হবে তো বটেই। যাঁদের দৃষ্টির মূল ভঙ্গিটিই ভ্রান্ত—অর্থাৎ গোড়ায়ই গলদ—তাঁদের চোখে কী ক'রে পড়বে যে অন্তঃশীলা প্রেমধারাটি শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানসাধনায় একটি মূল প্রেরণা? বহির্মুখী ফিতে গজকাঠি দাঁড়িপাল্লা বকযন্ত্রে কি পাওয়া যায় অন্তর্মুখী সত্যের যথার্থ দিশা?—গরিষ্ঠ মানুষকে কনিষ্ঠেরা কি কোনদিনও পেরেছে চিনতে?

একটা প্রবচনের আক্ষেপ মনে পড়ে—The world does not know its greatest men. কিন্তু যাঁরা তাঁর চরণতলে ব'সে দিনের পর দিন তাঁর স্নেহ উপদেশ ও দীক্ষার নির্দেশ পেয়েছেন, দিনের পর দিন তাঁর আশ্চর্য সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, যাঁরা দুঃখে দুর্দিনে পেয়েছেন তাঁর সান্ত্বনার গভীর স্পর্শ, নিরাশার গহ্বরে তাঁর বরাভয়, যাঁরা সংসারের হাজারো অবসাদের অনৈশ্চিত্যের অন্ধকারে পেয়েছেন তাঁর আন্তর প্রদীপ্তির মণিপ্রভায়, চ্যুতির গ্লানিকর লগ্নে তাঁর প্রশান্ত ক্ষমা, যাঁরা জীবনযজ্ঞের লক্ষ বিঘ্নের প্রত্যবায়ে পেয়েছেন তাঁর অফুরন্ত তাপসজ্যোতি, শোকের সংক্রান্তিলগ্নে তাঁর আশীর্বাণীর উজ্জ্বল রক্ষাকবচ—তাঁরা জানেন শ্রীঅরবিন্দের এ-উক্তি কত সত্য যে,

"It is only Divine Love that can bear the burden I have to bear, that all have to bear who have sacrificed everything else to the one aim of uplifting earth out of its darkness towards the Divine."

"শুধু দিব্য প্রেমই সে-ভার বহন করতে পারে যা আমাকে বহন করতে হচ্ছে, যা তাদের সবাইকেই বহন করতে হয়, যারা সব ছাড়ে শুধু পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে ভগবানের পানে তুলে ধরতে।"

আপনার বইটিতে আছে তাঁর এই দিব্য প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস, তাই তো এ-বইটি সর্বাদৃত হওয়া এত বাঞ্ছনীয় মনে করি, বিশেষ ক'রে এ-যুগে যখন মানুষ সব দিক দিয়েই আর্ত, ক্লিষ্ট, মুহ্যমান,—যখন অসূর্য তামসলোকের হিংস্র অনীকিনীর বৈজ্ঞানিক

বর্বরতায় সভ্যতার বনেদ পর্যন্ত উঠেছে টলমল ক'রে। এহেন সময়ে এই শ্রেণীর যোগী কবি জ্ঞানীর মুখেই তো আমরা শুনতে চাই প্রেমের এই আকাশবাণী যে, "ভাগবত প্রেম মানবিক প্রেম নয়,—সে গভীর, বিপুল, গাঢ়মৌন ; আমাদের হ'তে হবে তেমনি মৌন যদি আমরা চাই তাকে জানতে, তার ভাবে সাড়া দিতে" :

"The Divine Love, unlike the human, is deep and vast and silent ; one must become quiet and wide to be aware of it and reply to it.

"He who would bring the heavens here
Must descend himself into clay
And the burden of earthly nature bear
And tread the dolorous way."

"ধরার অধরা আলোকের বাণী যে বহি' আনিতে চায়
ধূলিতলে তাকে আসিতে হবেই নেমে
পৃথ্বীর ম্লান প্রকৃতির ভার সহিবে সে করুণায়
অপার বেদনে চলিবে---পারের প্রেমে।"

ইতি—

পুনশ্চ। সেদিন ফের আইরিশ কবি এ-ই-র কবিতা পড়ছিলাম। জানেন নিশ্চয়ই ইনি শুধু যে মস্ত কবি ছিলেন তা-ই নন মস্ত যোগীও। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছি ওদেশে এত বড় spiritual poet না কি আর জন্মায় নি। এঁর একটি কবিতায় আছে :

"When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of life
For its tenderness."

"অন্তরদীপ যখন জাগে
অল্পতে আর মন কি ভরে ?
কোমলতার আলোয় যে সে
বিশ্বে প্রেমে ছড়িয়ে পড়ে।"

কিন্তু মানুষ ভুল ভাবতে ভালোবাসে, তাই প্রায়ই মনে করে যে অন্তরের এহেন আলোর দীপ্ত কোমলতা যেন মাটিছাড়া, যেন অধ্যাত্ম প্রেম (spiritual love) বলতে বোঝায় স্বপ্নবিলাস জাতীয় কোনো সোনার হরিণ যাকে বাস্তবীরা কিছুতে মঞ্জুর করতে পারে না। সাহেবি ভাষায় বলতে গেলে যেন বলা যায় "it does not mean business," যেমন গত বছরে আমাকে বলেছিলেন আমার এক মার্কিন সহযাত্রী—ট্রেনে। হঠাৎ কথাটা পুনশ্চ দিয়ে লিখে ফেলতে সাধ গেল—আরো এইজন্যে যে দৃষ্টান্ত দিলে

শ্রীঅরবিন্দের প্রেম করুণা বা অনুকম্পার এই ব্যাপকতার কথা বোঝা একটু সহজ হবে।

৺উমার কথা আপনি জানেন—যাকে আমরা "হাসি" ব'লে ডাকতাম। ওর বাবা শ্রীধরণীকুমার বসুকেও জানতেন যিনি ১৯৩৮ সালে বাস উল্টে প'ড়ে আমার চোখের সাম্‌নে মারা যান। উমা আমাদের সঙ্গেই ছিল। এসব কথা আমার "ভূস্বর্গ-চঞ্চলে" লিখেছি আপনি পড়েছেন। এ-পরিবারটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় উমার সূত্রেই। ধরণীদা ওকে দিয়েছিলেন আমার হাতে সঁপে —গান শেখাতে। কী রকম উদার ছিলেন তিনি তা-ও আপনি হয়ত শুনে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এ সুন্দর পরিবারটির সঙ্গে আমি আরো জড়িয়ে পড়েছিলাম স্নেহের বন্ধনে—বিশেষ ক'রে আমার এই আশ্চর্য গানের ছাত্রীটির গীতিপ্রতিভা ও স্বভাব-মাধুর্যের টানে।

তার স্বভাবমাধুর্যের কথা আপনি বেশি জানেন না হয়ত—কিন্তু তার গান শুনেছেন। কী অপরূপ যে সে গাইত (বিশেষ ক'রে ভক্তির গান) তা-ও আপনার অজানা নেই। এমন কি গ্রামোফোনেও তার "শ্রীচরণে নিবেদন" "বঁধু কি আর কহিব আমি" শ্রেণীর ভক্তির গানে হৃদয় ওঠে দুলে। গত বাইশে জানুয়ারি (১৯৪২) সে মারা যায় মাত্র একুশ বৎসর বয়সে—প্রায় ন'মাস শয্যাগত থেকে। রোগশয্যায় ওকে যেন আরো বেশি ক'রে চিনেছিল সবাই—মানতে বাধ্য হয়েছিল ওর অসামান্যতা। সেসব কথা লিখতে যাওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে—যদিও এধরণের

অপরূপ চরিত্রের কথা না-লেখাই শক্ত। কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যত্র লিখেছি ব'লে আজ থাক এ প্রসঙ্গ—আমার মূল বক্তব্যেই ফিরে আসি।

ওর অসুখ হয় গত মে (১৯৪১) মাসে। ওর খবর প্রায়ই পাঠাতেন শ্রীমতী রাণী মৈত্র—যিনি ওর রোগশয্যায় শুশ্রূষাও করতেন সে সময়ে। তিনি আমাকে লেখেন, ও গান শুনতে এত চায়—প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা ওর খবর নিতেন নিয়মিত। তাঁদের আশীর্বাদও ওকে পাঠানো হ'ত। কিন্তু নানা রকম উপসর্গ জুটল—ওর অবস্থাও ক্রমশই খারাপ হ'তে লাগল। শেষটায় শ্রীবিধান রায় মহাশয়কে তার ক'রে যখন উত্তর পেলাম তখন মনে হ'ল, ওর এ-কঠিন অসুখে যদি যাই ওর কাছে, হয়ত ওর মন একটু ভালো রাখা যেতে পারে গান শুনিয়ে গল্প ক'রে। স্নেহে ও গানে ওর অভিমানী স্বভাবটি তেম্‌নি সাড়া দিত যেমন সাড়া দেয় শিশিরে ভেজা কুঁড়ি ভোরের আলোয়।

কিন্তু গুরুদেবের কাছে এ-প্রস্তাব করলাম বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে। কারণ শুনেছিলাম তিনি নাকি আদৌ অনুমোদন করেন না কারুর বাইরে যাওয়া—বাধ্য হ'য়ে অনুমতি দিলেও না। তাই আমি শ্রীঅরবিন্দকে একটু জোর দিয়েই লিখেছিলাম যে তিনি শুধু "অনুমতি" দিলে আমি যাব না "অনুমোদন" করলে তবেই যেতে পারি। তিনি ব'লে পাঠালেন "I quite approve."

একথাটার উপরে এত জোর দিচ্ছি কেন আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন? এস্থত্রে আমি শ্রীঅরবিন্দের উদারতার কথাই

বলতে চাইছি যে-উদারতার মহিমা আমি নিজে যেন আরো গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছি তাদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যারা তাঁর উদার-তাকে কিছুতে বোঝে না—ভাবে যে তিনি বুঝি ঠিক তাদের ছন্দেই ভাবেন, চলেন, বলেন, স্বপ্ন দেখেন। কি বলতে চাইছি একটা উদাহরণ দিলে আরো স্পষ্ট হবে। একজনের কাছে শুনলাম তাঁর যোগ করতে হ'লে কারুর সঙ্গেই মেলামেশা চলবে না। (তাঁর খুব দোষ দিচ্ছি না, তাঁর ক্ষেত্রে হয়ত বেশি মেলামেশা না করাই ভালো—এই উপদেশই তিনি পেয়েছিলেন) আমি ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দকে লিখলাম যে "এ-সাধকটির মতন চুপটি ক'রে মুখটি বুজে ঘরে বন্ধ হ'য়ে না থাকলে যদি ভগবদ্দর্শন আমার না হয় তাহ'লে এ-জন্মে সম্ভবত নয়নকে আমার উপবাসী থেকেই কাটাতে হবে, তবে জন-শ্রুতি এই যে যেহেতু আপনি একলা থাকেন সেহেতু সিদ্ধান্ত করতেই হবে যে একলা থাকলেই আপনি সবচেয়ে বেশি খুসি হন (Q.E.D)। কী করি বলুন দেখি?" শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন: "If am living in my room it is not out of a passion for solitude and it would be ridiculous to put forward this purely external circumstance—or X's withdrawnness which is a personal necessity of *his* sadhana—as if it were the obligatory sign of a high advance in the Yoga or Solitude the aim; these are simply incidents which none are called out to imitate. So you need not be anxious: Solitude

is not demanded of you, for an ascetic dryness or isolated loneliness cannot be your spiritual destiny since it is not consonant with *your* swabhaba which is made for joy, largeness, expansion, a comprehensive movement of the life-force."

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী সমৃদ্ধ উদারতাকে বোঝা সহজ নয়। মানুষ প্রায়ই নিজের মনের ছাঁচে ঢালাই করতে চায় যাঁদেরকে ভক্তি করে। তাই শ্রীঅরবিন্দকে যে অনেকেই এভাবে নিজের মনের মাপসৈ ক'রে কাটছাঁট ক'রে গ্রহণ ক'রে তাঁর ব্যাপক ব্যক্তিস্বরূপকে অঙ্গহীন করবেন এতে খুব আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। একজনের কাছে শুনলাম যে শ্রীঅরবিন্দের যোগে নাকি স্নেহ প্রীতি বন্ধুত্ব অচল। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জবাব পেলাম :

"বন্ধুত্ব বা স্নেহপ্রীতির যে আমার যোগে কোনো স্থান নেই এমনও নয়···কেবল বেশির ভাগ মানবিক বন্ধুত্বের যে-বনেদ, আমরা চাই হৃদয়বৃত্তির প্রতিষ্ঠা হোক তার চেয়ে কোনো দৃঢ়তর বনেদের 'পরে। আসলে বন্ধুত্ব সৌভ্রাত্র্য প্রীতি—এসবকে আমরা বরণীয় মনে করি ব'লেই চাই তাদের ছন্দবদল যাতে ক'রে এদের ভরাডুবি না হয় দম্ভ অহমিকা ঈর্ষা কৃতঘ্নতা প্রভৃতির সংঘাতে।···আমাদের যোগ কৃচ্ছ্রপন্থী নয়। তার লক্ষ্য শুদ্ধি—উদাসীন কঠোরতা নয়। যে-সুষমা—হার্মনি—আমাদের অভীপ্সিত তাতে বন্ধুত্ব ও প্রেমের

ঝঙ্কার তো থাকাই চাই।"*—কাজেই তাঁর এসব আশ্বাসের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে রওনা তো হওয়া গেল।

মান্দ্রাজে এসে দেখি কি, আমার সহযাত্রী এক প্রিয়দর্শন প্রবীণ মার্কিন ডাক্তার। দেখতে দেখতে আলাপ জমিয়ে নেওয়া গেল। লোকটির মুখচোখে একটা সরল সদাশয়তার ছাপ এমন স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল যে ভাব না জমিয়ে উপায় ছিল না। লোকটি যে সত্যিই আদর্শবাদী তার দু'চারটি কথায়ই বুঝতে পারা গেল। নিজের জীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কথাও এক নিশ্বাসে ব'লে ফেললেন। মানুষের মনের পরশ আমার প্রিয়, তাই ভাব হ'য়ে গেল আরো সহজে।

আমার হাতে ছিল শ্রীঅরবিন্দের Life Divine. হঠাৎ দেখি তিনি পাতা উল্টোচ্ছেন। অতঃপর দেখা গেল তাঁর কপালে

*...nor is friendship or affection excluded from the Yoga...Only we seek to found them on a surer basis than that on which the bulk of human friendships are insecurely founded. It is precisely because we hold friendship, brotherhood, love to be sacred things that we want this change, because we do not want to see them broken at every moment by the movements of the ego, soiled and spoiled and destroyed by the passions, jealousies and treacheries to which the vital is prone. It is to make them sacred and secure that we want them rooted in the soul, founded on the rock of the Divine. Our Yoga is not an ascetic Yoga : it aims at purity but not at a cold austerity. "Friendship and love are indispensable notes in the harmony to which we aspire." (From a letter dated 9. 10. 1934.)

রেখা পড়েছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতেই ডাক্তার সাহেব বললেন : জ্ঞানী ও যোগী শ্রীঅরবিন্দের নাম তিনি শুনেছেন অনেক-দিনই কিন্তু—তিনি যে-ধরণের জ্ঞানের বাণী এনেছেন তাতে না কি প্রেমের স্থান নেই এইজন্যেই তাঁর খটকা লেগেছে।

"সে কি সাহেব ?", বললাম আমি বাধা দিয়ে। "এ-ধরণের আষাঢ়ে গল্প কার কাছে শুনলে তুমি ? এই দেখ"—ব'লে Life Divine-এর Ascent of Life অধ্যায় থেকে খুলে ধরলাম :

('প্রেমের স্বধর্ম হ'ল আদান-প্রদান যাতে দেওয়ার আনন্দ প্রথমটায় থাকে পাওয়ার আনন্দের সমান, কিন্তু শেষটায় হ'য়ে ওঠে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বড়। কেবল, এটা ঘটে তখনই যখন সে-প্রেম আপন অন্তরের আলোর প্রেরণায় নিজেকে ছাড়িয়ে দীপ্ত হ'য়ে উঠতে চায় পরম ঐক্যবোধের সার্থকতায়, কাজেই তখন তাকে উপলব্ধি করতেই হয় যে, যাকে সে বলছে 'পর' (নাহম্), সে হ'ল তার অহম্-এর চেয়েও বৃহত্তর ও প্রিয়তর সত্তা-স্বজন।'*)

*... its (Love's) true law is to establish an equal commerce in which the joy of giving is equal to the joy of receiving and tends in the end to become greater ; but that is when it is shooting beyond itself under the pressure of the psychic flame to attain to the fulfilment of utter unity and has therefore to realise that which seemed to it as not-self as an even greater and dearer self than its own individuality. (THE LIFE DIVINE......VOL. I......P. 313)

সাহেবের কেমন যেন একটু ধাঁধা লেগে গেল মনে হ'ল, যদিও মুখে বললেন: "বড়ই চিত্তাকর্ষক···চিত্তাকর্ষক।"

আমি হেসে বললাম: "ও তো তোমাদের বাঁধা গৎ বন্ধু which at best means nothing at all."

সাহেবও হেসে ফেললেন, বললেন অগত্যা: "আমার বাধছে কেন জানো? এসব কথা শুনতে সুন্দর হ'লেও একটা 'কিন্তু' থেকে যায় ব'লে।"

"যথা?"

"তাহ'লে বলি শোনো একটু খুলে।" ব'লে সাহেব বেশ জুৎ ক'রে একটা চুরুট ধরালেন, তারপর সুরু করলেন:

"তোমাকে বলেছি আমি চোখের ডাক্তার সার্জন—ছানি কাটি। এ-কাজটা আমি সত্যিই ভালো কাজ মনে করি, কেন না আমি চাক্ষুষ করেছি—and seeing is believing জানোই তো—যে এর ফলে কত অন্ধলোক চক্ষুষ্মান হয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন এই যে, এই ধরণের প্রত্যক্ষ সেবা—service—দৃষ্টিগম্য প্রেম নিয়ে তোমাদের যোগীরা কারবার করেন কি না? Do they really mean business when they say: 'Love the not-self'—যা তুমি এইমাত্র প'ড়ে শোনালে?"

হাসি একটু পেল বৈ কি। এরা সব কিছুরই চাইবে কাটাছাঁটা প্রমাণ এজেহার! মানুষের মূল্য ধরে এরা তার কীর্তিকলাপের ওজনদরে—অন্তর্বিকাশের, "হ'য়ে-ওঠার" খবরকেই মনে করে বাহ্য, অবান্তর। মনে পড়ল শ্রীঅরবিন্দের একটি কথা: "মানুষ যে

বাস্তবের পিছুটানে এখনো ঝুঁকে রয়েছে বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে··· বোকার মতন অবিশ্বাসী হবার ক্ষমতা যে এখনো তার অপর্যাপ্ত !"* কিন্তু উদ্ধৃতিটি দেখিয়ে সাহেবকে আর তাতালাম না, বললাম : "ভগবানের করুণা ব'লে কিছু মানো কি বন্ধু ?"

"মানি"—বলতে না বলতে সাহেব উজিয়ে উঠলেন— "কিন্তু মানি এই জন্যই যে এ-করুণা প্রত্যক্ষ—concrete, it does mean business—কী ভাবে, বলি শোনো। তোমাকে বলেছি আমি ভারতবর্ষেই জন্মাই। তার পরে দেশে—আমেরিকায়—ফিরি শিক্ষার জন্যে। ডাক্তার হ'লাম। বুঝলাম ধীরে ধীরে খৃষ্টই জগতের একমাত্র ত্রাতা, তাঁর যে-বাণী সে-ই হ'ল পরম বাণী, অর্থাৎ সেবাধর্ম ছাড়া আর পথ নেই মানুষের। তাঁকে ডাকতাম রোজ, 'দেব ! আমাকে যেখানে হয় পাঠাও দুঃস্থ মানুষের সেবা করতে। যদিও আমি ভারতবর্ষেই ফিরতে চাই—কিন্তু তুমি যেখানে পাঠাবে যাব—কেবল—ক্ষমা কোরো প্রভু—আফ্রিকা বাদে।'

"প্রার্থনা করতে করতে কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে এ তো সাঁচ্চা আত্মসমর্পণ—Thy will be done—নয়। আফ্রিকা

*"But the human race is still weighted by a certain gravitation towards the physical, it obeys still the pull of our yet unconquered earth-matter... It has, too, still a great capacity for sceptical folly, an immense indolence, an enormous intellectual and spiritual timidity and conservatism when called out of the grooves of habit." (VOL. II, P. 655)

বাদে কেন! নিজেকে ধিক্কার দিয়ে শেষটায় প্রার্থনা করলাম চোখের জলের নদী বইয়ে দিয়ে—'আচ্ছা প্রভু, পাঠাও আফ্রিকাতেই—যদি তোমার ধর্মে সয়'—হাসলেন বন্ধুবর—কিন্তু জানো কি বন্ধু, যেদিন অন্তর থেকে এ-প্রার্থনায় সায় এল তার পর দিনই প্রস্তাব এল ভারতবর্ষে মিশনরি ডাক্তার হ'য়ে যাবার। একেই বলি ভগবানের প্রত্যক্ষ করুণা, কংক্রীট ভালোবাসা। তোমার গুরু এইভাবে ভালোবাসেন কি—দুঃস্থ ক্লিষ্ট আর্ত্ত মানুষের দুঃখে এই রকম প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দেন কি? না ভালোবাসা সম্বন্ধে দুচারটে অনবদ্য বুলি আওড়েই খালাস? শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না বন্ধু!"

কী করি, এখন আমার ঝুলিও ঝাড়তে হ'ল—গুরুদেবের কাহিনীর ঝুলি। কত দুঃখের সময়ে আমরা জনে জনে কতবারই পেয়েছি তাঁর অপরূপ সান্ত্বনা, উপদেশ, জ্ঞানের বাণী—সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি—"দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদৈব"—সেই অভয়বাণী: বলি দরিদ্র নির্বিশেষে তাঁর সবাইকে বোঝানো চিঠির পর চিঠি লিখে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত (শেষাশেষি রোজ তাঁকে রাত তিনটে চারটে পর্যন্ত জেগে রোজ সাত আট ঘণ্টারও বেশি চিঠি লিখতে হ'ত প্রত্যহ কয়েক বৎসর ধ'রে)—সর্বোপরি, তাঁর স্নেহের কত অনুপম বাণী: "Your friends have treated you badly but be sure our friendship will never fail you."—কত ক্লিষ্ট আর্ত মানুষ শোক তাপ জুড়িয়েছে তাঁর অহৈতুকী স্নেহে, অভয় চরণচ্ছায়ায়—ভ্রষ্টলক্ষ্য লগ্নে কত উদ্‌ভ্রান্তকে দেখিয়েছেন

চিরলক্ষ্যের দিশা—কত দুর্বলকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাশ্বাসকে ভরসা, নিঃসম্বলকে পথের পাথেয়—কত বিত্তহীন অনাদৃতকে গ্রহণ করেছেন চিরজীবনের জন্যে, নির্জীবকে দিয়েছেন জীবনীশক্তি—কত রুগ্নের সংকট রোগে শুধু আশীর্বাণী নয় দিনের পর দিন তাঁর যোগ শক্তি পাঠিয়ে তুলেছেন সারিয়ে—যদিও সব ক্ষেত্রে সারে নি, তবু শিবেরও অসাধ্য রোগেও যে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেন নি তিনি, এ-ই কি কম কথা?"...

সাহেবের মুখচোখে আমার উদ্দীপনার একটু ছোঁয়াচ যেন লাগল, বললেন: "বড় ভালো লাগল বন্ধু এসব কথা শুনে—বিশেষ তাঁর ঐ বছরের পর বছর রাত তিনটে চারটে পর্যন্ত জেগে চিঠির পর চিঠি লেখার জন্যে—আর—কিছু মনে কোরো না বন্ধু—রোগীর রোগ সারানো। আমি ডাক্তার ব'লে এটা অন্তত বুঝতে পারি।

হাসি এল ফের, বললাম মনে মনে: সাধু সাধু, কেবল ঐ সঙ্গে যদি এটাও বুঝতে বন্ধু, যে যা তুমি এখনো বুঝতে পারো না তা-ও সত্য হ'তে পারে—**there are more things in heaven and earth**—কিন্তু মুখে এ-ঈষদ্ধাস্য প্রকট করলাম না, বললাম হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়: "আমি কেন কলকাতা যাচ্ছি জানো? আমার এক মৃত বন্ধুর মরণাপন্ন মেয়েকে দেখতে। সে আমার আত্মীয়ও নয়—গানের ছাত্রী। সাংসারিক দিক দিয়ে আমার 'পরে তার কোনো দাবি-দাওয়া ছিল না তো—তবু নির্জনে যোগসাধনা ছেড়ে যে চলেছি তাকে দেখতে, এতে গুরুদেবের শুধু সায় না

আশীর্বাদ আছে মনে রেখো।" মানে হাসি সম্বন্ধে অনেক কথাই বললাম, বললাম কেমন ক'রে বছর দুই আগে বাস উল্টে প'ড়ে ধরণীদা মারা যান আমার চোখের সামনে। বললাম তার পরের বছরেই ওর একমাত্র ছোট ভাইয়ের মারা যাওয়ার কথা। অথচ কী সহিষ্ণুতা তেজস্বিতা ওর! কারুর কাছে কি এতটুকু চোখের জল ফেলবে? বললাম ওর গীতি-প্রতিভার কথা, ওর চরিত্রের শুভ্রতার কথা, ওর পরকে আপন করার কথা, সেবাপরায়ণতার কথা—এমন অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও নিরহংকারের কথা, বললাম ওর কণ্ঠ-লাবণ্যের কথা—যা শুনলে অভক্তের মনেও জাগত ভক্তি……

সাহেবের মুখচোখ নরম হ'য়ে এল শুনতে শুনতে, বললেন: "আহা! মেয়েটি যেন সেরে ওঠে।" ব'লে একটু থেমে: "কিন্তু ওকে জানেন তোমার গুরুদেব?"

"জানেন বলতে সচরাচর মানুষে যা বোঝে সে ভাবে জানেন না, তাকে চোখে কখনো দেখেন নি, কিন্তু স্নেহ করেন গভীর ভাবেই। এর আগেও তার অসুখ বিসুখে শুধু আশীর্বাদ নয় তাঁর যোগশক্তির কল্যাণস্পর্শ পাঠিয়েছেন—তার সিম্‌টমের খবর নিয়েছেন, এখনো খুঁটিয়ে নেন—যেমন অবশ্য অন্য অনেক রুগ্নের বেলায়ও নিয়ে থাকেন। অথচ মনে রেখো এ-পরিবারের কেউই তাঁর যোগের কোনো খবরই রাখে না—হয়ত জানবেও না কোনোদিন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহামূল্য সময় থেকে কতখানি ব্যয় করেছেন তাদের রুগ্ন দুঃখী মেয়েটির খবর নিতে—কত ধ্যান করেছেন তাকে সারিয়ে তুলতে—কত অসুখে সে সেরেও উঠেছে তাঁরই শক্তিতে অথচ ভেবেছে সারল ডাক্তারি

বিত্থায়, কিন্তু তিনি এপর্যন্ত চান নি যে তারা মানুক তাঁর যোগশক্তি, চিনুক তাঁর করুণা।

সাহেব খুব স্পৃষ্ট হ'য়ে মাথা নাড়লেন, বললেন : "ডাক্তারিতে আর কতটুকু পারে বন্ধু—ভগবানের করুণা না থাকলে? আমরা তো উপলক্ষ্যমাত্র—যদিও সায়েন্স এখনো একথা মানে না। কিন্তু সে যাক, এ-রুগ্ন মেয়েটির জন্যে তোমার গুরুদেব যে তাঁর এতটা মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন শুনে বড় ভালো লাগল। আরো এই জন্যে যে ভগবানের করুণার কথা তোমার ছাত্রী আজও জানে না—কজনই বা জানে বলো 'for that matter?'

একটু পরে সাহেবই ফের কথা কইলেন : "কিছু মনে কোরো না বন্ধু, আমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে এই রকমই শুনেছিলাম যে তিনি নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত, তাই একা একা থাকেন। কাজেই মনটা একটু বিমুখ ছিল বৈ কি। কিন্তু এজন্যে এখন আমি সত্যি অনুতপ্ত, বিশ্বাস কোরো। কারণ যে-গুরু তাঁর নিজের মুক্তির চিন্তা ছেড়ে অতি ক্লিষ্ট দুঃখী মানুষের জন্যে এতটা অনুভব করতে পারেন—তাঁর যোগের জ্ঞান না বুঝলেও তাঁর প্রেমের মহত্ত্ব আমি বুঝতে পারি, তাঁর মিস্‌টিক দীক্ষা না বুঝলেও তাঁর হৃদয়বত্তাকে সুন্দর ব'লে মানতে আমার মন একটুও বাধা পায় না। কারণ খৃষ্টের কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি যে প্রতিবেশীদেরকে আমাদের তেম্‌নি ভালোবাসতে হবে যেমন বাসি আমরা নিজেদেরকে। তাই আমার কাছে সেই জ্ঞানই বরেণ্য কর্মে যার তর্জমা হয় নিস্বার্থ সেবায়, নির্মল প্রেমে।"

"সে কথা সত্য বন্ধু," বললাম আমি, "কিন্তু তোমার মনে হয় না কি যে এখানেও একটু 'কিন্তু' থাকতে পারে—তোমারই ভাষায়?"

"মানে?"

"মানে, নির্মল প্রেমের তত্ত্ব শুনতে সরল হ'লেও উপলব্ধি করা কি কথার কথা মনে করো তুমি?"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"যাদের প্রেম খানিকটা নির্মল নয় তারা কি নির্মল প্রেম ঠিক মতন বোঝে মনে করো? অত কথায় কাজ কি, তোমার খৃষ্টদেবের দৃষ্টান্তই নেও না। পন্টিয়াস পাইলেট কি তাঁর প্রেমকে বুঝেছিলেন? না, বুঝলে তাঁকে ছেড়ে দিতেন ঐসব রক্তলোলুপদের হাতে?"

সাহেব মুখ নিচু ক'রে রইলেন। আমি বললাম: "আরো স্মরণ করো ঐ হিংস্র গুণ্ডাদের কথা। তাদের তো তিনি উপকারই করতেন সদাসর্বদা। তবু তাদের কাছে তাঁর নিটল স্বচ্ছ প্রেম এত ঝাপসা ঠেকল কেন যার দরুণ তারা অমন দেবদূতকে মারল পশুকেও মানুষ যে ভাবে মারে না? কী ব'লে তারা অমন সুন্দর মহাপুরুষের মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে পারল ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে, লাঞ্ছনা করতে?"

"আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ, কিন্তু—"

"শোনো," বললাম আমি, "কয়েক বৎসর আগে আমি নিজে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কত তর্ক যে করতাম জানো না। আজ সেকথা

ভাবতেও লজ্জা বোধ করি কিন্তু তর্ক করতাম না বুঝে—খাঁটি মেকির প্রভেদ না চিনে, এইটুকুই আমার সাফাই। তাই মনে করতাম সে সময়ে যে ভগবানের করুণাও বুঝি একটা কথার কথা, বুঝি আসলে সে সুদূর উদাসীন—যাকে তোমরা বলো cold. একবার তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম একথা ক্ষুব্ধ হ'য়ে।"

"কী বলেছিলেন তিনি ?" শুধাল ও উৎসুক কণ্ঠে।

"বলেছিলেন যে 'ভগবানের ভালোবাসা কখনই উদাসীন হ'তে পারে না। তবে সে-ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসার মতন নয় যে দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠেই নিভে যাবে প্রতিদানের ইন্ধন না পেলে। সে স্বভাবে স্থির, সর্বব্যাপী, স্বয়ংসিদ্ধ—সূর্যের আলো যেমন।' তাছাড়া তিনি আরো লিখেছিলেন আমাকে যে 'ভগবানের প্রেম এমন কি ব্যক্তিগতও হ'তে পারে, কেবল মানুষের গড়পড়তা ব্যক্তিগত প্রেমের মতন আত্মাভিমানী নয় তার ছন্দ।'* বলতে চাও কি তুমি যে এহেন প্রেম গড়পড়তা মানুষ বুঝতে পারে ? তাই বলছিলাম যে এখানেও একটু কিন্তু

* শ্রীঅরবিন্দের মূল চিঠির ভাষা ছিল এই : "Love cannot be cold, for there is no such thing as cold love, but the love of which the Mother speaks is something very pure, fixed and constant : it does not leap into fire and sink for want of fuel but is steady and all-embracing and all-existent like the light of the sun. There is also a divine love, that is personal but it is not like the ordinary, personal human love dependent on any return from the person : it is personal but not egoistic."

আছে। প্রেম প্রেম ক'রে হুঙ্কার দেওয়া যত সহজ তার ঠিক হুঙ্কারটিতে সাড়া দিতে পারা ঠিক তত সহজ কি ?"

সাহেব আর তর্ক করলেন না—কিন্তু মনে হ'ল কোথায় তাঁর মনে লেগেছে। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল সত্যিই। সে বলেছিল শ্রীঅরবিন্দের দর্শনার্থী হ'য়ে একবার আসবে। যদি আসে দেখাব তাকে সেই চিঠিটা যেটা এখানে আপনি থাকার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন। কেন দেখাব জানেন ? তার একটা ধারণা ছিল যেটা সহৃদয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় : যে, অধ্যাত্মজ্ঞান বুঝি বড়ই শুষ্ক—যেকথা আরও রসালভাবে বলেছেন চৈতন্যচরিতামৃতকার :

অরসিক কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।

কিন্তু এধরণের কথার পিছনে আমাদের মন কেমন যেন একটা একপেশো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয় না কি ? যদিও শুনেছি শুষ্ক জ্ঞানী ব'লে এক ধরণের জ্ঞানী আছে কিন্তু তারা যে খাঁটি জ্ঞানী এ-এজাহার দেবে কে ? জনশ্রুতি কিছু প্রমাণ নয়। অন্তত আমার মন সহজেই মনে নেয় যেকথা কৃষ্ণ-প্রেম একবার লিখেছিলেন আমাকে :

"He who knows and does not love does not know, while he who loves and does not know does not love."

যে বলে : সে জানে, শুধু ভালো নাহি বাসে
জেনো সে আজিও জানে না, পায় নি আলো।

যে বলে : সে, ভালো বাসে, শুধু জানে না সে
জেনো সে আজিও বাসে নি বাসে না ভালো।

একথা আমার আরো মনে হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান ও করুণার স্পর্শ পেয়ে। কত দরদের সঙ্গে কত আদরে কত ধৈর্য ধ'রে যে তাঁকে বোঝাতে দেখেছি অগুন্তিবার আমাদের মতন অল্পদর্শী অবোধদেরকে—কত স্নিগ্ধ প্রেমের রসে রসিয়ে। এ কথার দৃষ্টান্ত দিতেই ঐ চিঠিটি উদ্ধৃত করব আরো এই জন্যে যে এ পত্রটিতে বড় অপূর্ব হ'য়ে ফুঠেছে—যুগপৎ—তাঁর ঋষির দৃষ্টি, জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রেমীর প্রেম। কিন্তু আগে আমার প্রশ্নটা ছিল কি—বলি সংক্ষেপে। আমি তাঁকে (৮. ২. ৪২ তারিখে) এক সুদীর্ঘ পত্র লিখি। তার সার মর্ম এই :

"গুরুদেব

আমার বন্ধু জ্ঞান ঘোষের (৫.২.১৯৪২ তারিখের) চিঠিটি পাঠালাম। মৃত্যুশয্যার হাসির যন্ত্রণার কথা সে লিখেছে আমি জানতে চেয়েছিলাম ব'লে। আপনি জানেন হাসি বাঁচতে চাইত না। আপনার কাছেই শুনেছি বাঁচতে না চাইলে বাঁচানো বড়ই শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এও তো আপনি জানেন যে সে বাঁচতে চাইত না যে শুধু নিজের দুঃখে তা নয়। যখন ওর বাবা বেঁচে তখনই ওর মধ্যে এ-বিষাদ প্রায়ই ছেয়ে আসত লক্ষ্য করেছি। বলত : জগৎটা মোটেই ভালো জায়গা নয়। এখানে ভালো লোক থাকে যে-দুচারজন তারা দুঃখই পায় বেশি। তাই এখানে তাদের না থাকাই ভালো। এ-জগতের হিংসা ঈর্ষা ক্ষুদ্রতা ও

নিষ্ঠুরতা দেখে সে ভারি বেদনা বোধ করত। আমাকে মাঝে মাঝে হেসে ঠাট্টা করত আমি কাউকে বেশি ভালো বললে। অবশ্য তার মুখে এ সবই মানাতো। নিজে যে স্নেহময়ী, পুষ্পশুভ্রা সত্যনিষ্ঠা—মলিনতায় অসত্যে অপ্রেমে তার গভীর দুঃখবোধ বোঝা যায়। কিন্তু তার কথা বাদ দিলেও তার অভিযোগের মধ্যে কি অনেকটা সত্যও নেই? মায়াবাদীরাও চিরটাকাল তো এই কথাই ব'লে এসেছেন প্রকারান্তরে যে এ-জগৎ শুধ্রোবার নয়, এখানে জন্ম শুধু এই সাধনার জন্যে যাতে ক'রে আর না জন্মাতে হয়—যেমন কঠ বলেছে: 'স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে—' 'এমন পদ পাওয়া চাই যার পর আর না ভুগতে হয় জন্মানোর কর্মভোগ'—যেকথা গীতায়ও বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ একটু অন্য ভাষায় যে এ-জগৎ যখন 'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্' তখন ('অনিত্যম্ অসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্') এ-অনিত্য দুঃখময় জীবনকে চেয়ে কী হবে—আমাকেই চাও একান্ত ক'রে, যেহেতু 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—আমাকে পেলে আর জন্মাতে হবে না কোনোদিন। জগতে দিন দিন যে মহামারী কাণ্ড হচ্ছে যেভাবে আসুরিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে—যে-রেটে হৃদয়ের সব কোমল বৃত্তি শুকিয়ে যাচ্ছে হিংসার খরতাপে তাতে মনে হয় না কি যে শিশুর মুখে দৈববাণী জাতীয়ই কিছু একটা হয়েছিল হাসির মুখে, যখন ও বলেছিল এ-জগতে ভালো লোকের না-জন্মানোই ভালো? ওর কথা ভাবতে আমার আরও দুঃখ হয় এই জন্যে যে এমন একটি অপূর্ব ফুল এমন নিখুঁৎ ক'রে যদি

বিধাতা গড়লেনই এ খুঁতে-ভরা জগতে, তখন নিজের হাতে গড়া সে কুঁড়িটি কার শাপে ঝ'রে গেল না ফুটতে? ওর গীতি-প্রতিভার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—মেয়েদের মধ্যে যার জুড়ি আমার তো অন্তত চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত—কিন্তু এমন ভক্তির গান যে গাইতে পারত, যার আবেদনে অভক্তের মনেও জাগত ভক্তি—তার সে কণ্ঠ এমন নিষ্ঠুরভাবে নীরব ক'রে-দিয়ে ভগবানের কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হ'ল?

শেষে একটা প্রশ্ন জাগে ফিরে ফিরে আমার মনে। ভগবানের করুণায় আমার বিশ্বাস আছে—কিন্তু শুনতে পাই এ-করুণারও কি সর্ত আছে। তা যদি হয় তাহ'লে একথা মনে করা কি চলে না যে, সারা জগতে হিংসা ও মিথ্যার তুফান যতই ঘুনিয়ে আসছে ভগবানের আলো ততই যাচ্ছে দূরে স'রে? কারণ এ-হেন পরিবেশে ভগবানের করুণার অবতরণ হবে এ-আশা কি দুরাশা নয়? মায়াবাদীরা বলেছে—এ জগৎ হ'ল একটা দুঃস্বপ্ন—কাজেই জ্ঞানে না জাগলে এর কাটান্ মিলতে পারে না। কথাটা কি একেবারেই ভিত্তিহীন?

শেষ প্রশ্ন—ভগবানের সত্য কি এ জগতে সত্যিসত্যিই সক্রিয়? হ'লে কি আজ দুনিয়াদারিতে মিথ্যাই হ'ত এভাবে সর্বেসর্বা? যদি বলেন মিথ্যার পিছনে রয়েছে সে-সত্য—নৈলে মিথ্যাও পারত না টিঁকতে, তাহ'লেও প্রশ্ন থাকে—এ মিথ্যার জগতে বসবাস ক'রেও কি সে-সত্যকে চাক্ষুষ করা সম্ভব? তরী যখন ডুবুডুবু তখনও কাণ্ডারী যদি থাকেন নেপথ্যে তাহ'লে কী

ক'রে সেটা মানুষ বুঝবে যদি নৌকাডুবি থেকে বাঁচার আশা হয় সুদূর পরাহত ?"

এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ যে-দীর্ঘপত্রটি আমাকে লেখেন সেটি এখানে তুলে দিয়ে এ-যাত্রা পুনশ্চের ইতি টানি :—

Dilip,

The question you have put raises one of the most difficult and complicated of all problems and to deal with it at all adequately would need an answer as long as the longest chapter of the "Life Divine". I can only state my own knowledge founded not on reasoning but on experience that there is such a guidance and that nothing is in vain in this universe.

If we look only at outward facts in their surface appearance or if we regard what we see happening around us as definitive, not as processes of a moment in a developing whole, the guidance is not apparent; at most we may see interventions occasional or sometimes frequent. The guidance can become evident only if we go behind appearances and begin to understand the forces at work and the way of their working and their secret significance. After all, real knowledge—even scientific knowledge—comes by going behind the surface phenomena to their hidden processes and causes. It is quite obvious that this world is full of suffering, and afflicted with

transience to a degree that seems to justify the Gita's description of it as "this unhappy and transient world, *anityam asukham*." The question is whether it is a mere creation of Chance or governed by a mechanical inconscient Law or whether there is a meaning in it and something beyond its present appearance towards which we move. If there is a meaning and if there is something towards which things are evolving, then inevitably there must be a guidance—and that means that a supporting Consciousness and Will is there with which we can come into inner contact. If there is such a Consciousness and Will, it is not likely that it would stultify itself by annulling the world's meaning or turning it into a perpetual or eventual failure.

This world has a double aspect. It seems to be based on a material Inconscience and an ignorant mind and life full of that Inconscience ; error and sorrow, death and suffering are the necessary consequence. But there is evidently too a partially sucessful endeavour and an imperfect growth towards Light, Knowledge, Truth, Good, Happiness, Harmony, Beauty,—at least a partial flowering of these things. The meaning of this world must evidently lie in this opposition ; it must be an evolution which is leading or struggling towards higher things out of a first darker appearance. Whatever

guidance there is must be given under these conditions of opposition and struggle and must be leading towards that higher state of things. It is leading the individual, certainly, and the world, presumably, towards the higher state, but through the double terms of knowledge and ignorance, light and darkness, death and life, pain and pleasure, happiness and suffering ; none of the terms can be excluded until the higher state is reached and established. It is not and cannot be, ordinarily, a guidance which at once rejects the darker terms, still less a guidance which brings us solely and always nothing but hapiness, success and good fortune. Its main concern is with the growth of our being and consciousness, the growth towards a higher self, towards the Divine, eventually towards a higher Light, Truth and Bliss ; the rest is secondary, sometimes a means, sometimes a result, not a primary purpose.

The true sense of the guidance becomes clearer when we can go deep within and see from there more intimately the play of the forces and receive intimations of the Will behind them. The surface mind can get only an imperfect glimpse. When we are in contact with the Divine or in contact with an inner knowledge or vision, we begin to see all the circumstances of our life in the new light and can observe how they all tended without our knowing

it towards the growth of our being and consciousness, towards the work we had to do, towards some development that had to be made,—not only what seemed good, fortunate or successful but the struggles, failures, difficulties, upheavals. But with each person the guidance works differently according to his nature, the conditions of his life, his cast of consciousness, his stage of development, his need of further experience. We are not automata but conscious beings and our mentality, our will and its decisions, our attitude to life and demand on it, our motives and movements help to determine our course ; they may lead to much suffering and evil, but through it all the guidance makes use of them for our growth in experience and consequently the development of our being and consciousness. All advance by however devious ways, even in spite of what seems a going backwards or going astray, gathering whatever experience is necessary for the soul's destiny. When we are in close contact with the Divine, a protection can come which helps or directly guides or moves us : it does not throw aside all difficulties, sufferings or dangers, but it carries us through them and out of them—except where for a special purpose there is need of the opposite.

It is the same thing though on a larger scale and in a more complex way with the guidance of the

world movement. That seems to move according to the conditions and laws of forces of the moment through constant vicissitudes, but still there is something in it that drives towards the evolutionary purpose, although it is more difficult to see, understand and follow than in the smaller and more intimate field of the individual consciousness and life. What happens at a particular juncture of the world-action or the life of humanity, however catastrophical, is not ultimately determinative. Here too one has to see not only the outward play of forces in a particular case or at a particular time but also the inner and secret play, the far-off outcome, the event that lies beyond and the Will at work behind it all. Falsehood and Darkness are strong everywhere on the earth, and have always been so and at times they seem to dominate ; but there have also been not only gleams but outbursts of the Light. In the mass of things and the long course of Time, whatever may be the appearances of this or that epoch or movement, the growth of Light is there and the struggle towards better things does not cease. At the present time Falsehood and Darkness have gathered their forces and are extremely powerful ; but even if we reject the assertion of the mystics and prophets since early times that such a condition of things must precede the Manifestation

and is even a sign of its approach, yet it does not necessarily indicate the decisive victory— even temporary—of the Falsehood. It merely means that the struggle between the Forces is at its acme. The result may very well be the stronger emergence of the best that can be : for the world-movement often works in that way. I leave it at that and say nothing more. . . .

Hashi had reached a stage of her development marked by a predominance of the sattwic nature, but not a strong vital (which works towards a successful or fortunate life) or the opening to a higher light, —her mental upbringing and surroundings stood against that and she herself was not ready. The early death and much suffering may have been the result of past (prenatal) influences or they may have been chosen by her own psychic being as a passage towards a higher state for which she was not yet prepared but towards which she was moving, This and the non-fulfilment of her capacities would be a final tragady if there were this life alone. As it is she has passed towards the psychic sleep to prepare for her life to come.

February 17, 1942 Sri Aurobindo

যোগী

"Our whole being, soul, mind, sense, heart, will, life, body must consecrate all its energies so entirely and in such a way that it shall become a fit vehicle for the Divine. This is no easy task ; for everything in the world follows the fixed habit which is to it a law and resists a radical change. And no change can be more radical than the revolution attempted in the integral Yoga. Everything in us has constantly to be called back to the central faith and will and vision. Every thought and impulse has to be reminded in the language of the Upanishad that, "That is the Divine Brahman and not this which men adore."*

"আমাদের সমগ্র সত্তার দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, অন্তরাত্মা, সংকল্পের··· সমস্ত শক্তিকে এমন ভাবে উৎসর্গ করা চাই যাতে ক'রে সে হ'য়ে ওঠে ভগবানের যোগ্য আধার। ব্যাপারটা বড় সোজা নয় যেহেতু এ-জগৎ বদ্ধমূল অভ্যাসের খাতে চলতে চলতে তাকেই গ্রহণ ক'রে বসে স্বধর্ম ব'লে, ফলে সে আর চায় না কোনো আমূল পরিবর্তন। পূর্ণযোগ যে-তোলপাড় আনতে চায় তার চেয়ে আমূল পরিবর্তন তো আর কিছুই হ'তে পারে না। আমাদের মধ্যেকার সব কিছু দিয়ে নিরন্তর আমাদের কেন্দ্রীয় শ্রদ্ধা সংকল্প ও দৃষ্টিকেই ফিরে ফিরে বরণ করা চাই। আমাদের প্রতি চিন্তা প্রতি ঝোঁককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া চাই—উপনিষদের ভাষায় ···'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে'—তিনিই হ'লেন ব্রহ্ম, এ ও তা নয় যাদেরকে মানুষ উপাসনা করে।"

শ্রীমান আশ্চর্যকুমারেষু

আমার "প্রেমী" নিবন্ধটি প'ড়ে মনে হচ্ছে তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি এখনো। নইলে এত আশ্চর্য হ'য়ে লিখতে না ফের: "শ্রীঅরবিন্দের বাণী এত মর্মস্পর্শী, তবু কেন যে আমরা—বিশেষ

*শ্রীঅরবিন্দের নবলিখিত Synthesis of Yoga—Self-Consecration অধ্যায়।

করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়—তাঁহাকে বুঝিতে চাহি না, এ-রহস্যের কথা সময়ে সময়ে আমি সত্যই গালে হাত দিয়া ভাবি! তাঁহার নবলিখিত Synthesis of Yoga-এ সেদিন The Ascent of the Sacrifice অধ্যায়ে পড়িতেছিলাম প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব গভীর বাণীমন্ত্র যে

'Love that is worship is at once an aspiration and a preparation':

কী সুন্দর কথা! পড়িতে পড়িতে মন যেন গান গাহিয়া উঠিতে চায়:

'পূজাব্রত প্রেম সে যে আকাশের দীপ্ত অনুধ্যান
পরমের দীক্ষার নিশান।'

"কিন্তু একথা বলিতে পারে কে—এক বিশুদ্ধ প্রেমিক ছাড়া? অথচ তবু তো কই শ্রীঅরবিন্দের প্রেমসাধনার দিকটা বড় কেউ খেয়াল করেন না? কেন করেন না?—কেনই বা মহাযোগীর পূর্ণযোগ সম্বন্ধে মনীষীরা কেহই প্রাঞ্জল ভাষায় লেখেন না পাঁচজনের হিতার্থে? এ-প্রশ্ন কেন করিতেছি জানেন? শুনুন তবে একটু খুলিয়াই বলি। একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই শুরু করি।

"আপনি জানেন হাড়ে হাড়েই যে এ যুগে গুরুবাদ কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে উন্নাসিকদের স্বভাব-উন্নত নাসিকা আরও কতখানি সমুচ্চ হইয়া উঠে। আপনার 'ভূস্বর্গ-চঞ্চল' পুস্তকে পড়িয়াছি সেই বর্ষীয়সী জ্ঞানময়ীর কথা যিনি আপনার নামে বুদ্ধিভ্রংশের অপবাদ দিয়াছিলেন আপনি গুরুবাদ সমর্থন করেন এই অপরাধে। কিন্তু ইঁহারা কি জানেন শ্রীঅরবিন্দ কী ধরণের

গুরুবাদের পক্ষপাতী ? কখনো পড়িয়াছেন কি Synthesis of Yoga-এ Four Aids অধ্যায়ে এসম্পর্কে তাঁহার উজ্জ্বল গভীর বাণীমন্ত্র :

'...it is necessary that he (the sadhaka of the integral Yoga) should...cast from himself that exclusive tendency of egoistic mind which cries: '*My* God, *my* Incarnation, *my* Prophet, *my* Guru' and opposes to it all other realisation in a sectarian or a fanatical spirit.'*

"যতদূর মনে পড়ে আপনাকে সেই ব্রাহ্ম মহিলাটি তিরস্কার করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে গুরুবরণ করিলে আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভরাডুবি। একথা অস্বীকার করা চলে না যে সংকীর্ণমনা অনেক গুরু (বা কুলগুরু জাতীয় পেশাদার সুবিধাজীবী) এভাবে শিষ্যের স্বাধীন চিন্তা ও বিকাশের অন্তরায় হইয়া থাকেন তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়ার সুবিধা আছে বলিয়া। কিন্তু সংসারে সব কিছুরই ব্যভিচার আছে, বিকৃতি আছে, অপভ্রংশ আছে—কৃষ্ণপ্রেমের উপমা মনে পড়ে bath-water ময়লা বলিয়া

* "পূর্ণযোগের সাধকের চাই-ই চাই আত্মাভিমানী মনের হাঁকডাক বর্জন করা যে অসহিষ্ণু প্রবণতা বলে : 'আমার ভগবান্, আমার অবতার, আমার দিশারি, আমার গুরু'—যে অন্য সব উপলব্ধিকেই প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় একটা দলাদলির গোঁড়ামি তাকে পেয়ে বসে ব'লে।"

baby-in-the-tub-কেও তাহার সহিত বিসর্জন দেওয়ার নাম শিশুমঙ্গল সাধনা নহে।

"এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে—সত্য বিধি ও বিশুদ্ধ আদর্শটি কী। শ্রীঅরবিন্দ কি ঐ অধ্যায়েই এ-আদর্শ নির্ণয় করিয়া দেন নাই তাঁহার অপরূপ ঋষিমন্ত্র ঝঙ্কারে—

'But the wise Teacher will not seek to impose himself or his opinions on the passive acceptance of the receptive mind; he will throw in only what is productive and sure as seed which will grow under the divine fostering within.' He will seek to awaken much more than to instruct.* যেকি গুরুবাদের মনের কথা যাহাই হোক, খাঁটি গুরুবাদের অন্তরের কথা আত্মপ্রতিষ্ঠা নহে, ভগবানের আদেশ পালন: 'And it shall also be a sign of the teacher of the integral Yoga that he does not arrogate to himself Guru-hood in a humanly vain and self-exalting spirit. His work, if he has one, is a trust from above, he himself a channel, a vessel or a representative. He is a man helping his

* "বিচক্ষণ গুরু কখনই শিষ্যের গ্রহিষ্ণু মনের 'পরে চড়াও হবেন না, নিজেকে বা নিজের মতামতকে চাপাবেন না তার ঘাড়ে, তিনি শুধু বুনে যাবেন সেই বীজ যা অন্তরদেবতার বিনিয়োগে ফসল না ফলিয়ে ছাড়ে না। শেখানোর চেয়ে জাগানোর দিকেই তাঁর ঝোঁক।"

brothers, a child leading children, a Light kindling other lights, an awakened Soul awakening souls, at highest a Power or Presence of the Divine calling to him other powers of the Divine.'*

"কী সুন্দর কথা! আপনার কি মনে হয় না যে এ-শ্রেণীর গভীর বিনম্রতার বাণী সম্বন্ধে আমাদের দেশের মনস্বীদের লিখা উচিত?"

তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর আমি অনেকবারই দিয়েছি নানা আলোচনায়। তাই তুমি এ-প্রশ্ন ফের করলে কেন—যখন জানো যে শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা ও সাধনার বাণী সম্বন্ধে ভালো লেখা প্রকাশ হোক এ তাঁর প্রতি ভক্তই চাইতে বাধ্য? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, "ভালো লেখা" ভালো ব'লেই বিরল, যেহেতু দুরায়ত্ত। গুরুবাদে গুরুর প্রেমের কথা তুলেছ—বলেছও ঠিকই,

* "পূর্ণযোগদীক্ষাদাতার অভিজ্ঞান হচ্ছে এই যে তিনি গুরু হ'তে চাইবেন না কোনো আত্মস্ফীতির অভিমানে যে-অভিমান মানুষের মধ্যে এত ব্যাপক। যদি তাঁর কোনো কাজ থাকে তবে সে হ'ল উপর-থেকে-পাওয়া আদেশের প্রবর্তন, তিনি নিজে শুধু একটি প্রণালী,—আধার—প্রতিনিধি। তিনি যেন এসেছেন ভাই হ'য়ে ভাইয়ের কাজে সহায় হ'তে, শিশু হ'য়ে শিশুদের এগিয়ে দিতে, আলো হ'য়ে আরো সব আলো জ্বালাতে, প্রবুদ্ধ হ'য়ে আর সবাইকে প্রবুদ্ধ করতে: তাঁর শ্রেষ্ঠ বিকাশে তিনি হ'য়ে ওঠেন একটি বিভূতি, ভাগবত আবির্ভাব—যিনি আসেন ভগবানের আর আর বিভূতিদেরকে ডাক দিতে, কাছে টানতে।"

কেন না গুরুকে আমরা বরণ করতেই পারি না যদি না তিনি প্রেমের—দিব্য প্রেমের—প্রতীক না হন। কিন্তু হয়েছে কি জানো? প্রেম প্রেম ক'রে যে-সব হাঁকডাক দিনত্নিয়ায় আজ সব চেয়ে বেশি মুখর, শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে ঠিক সে-শ্রেণীর প্রেমের প্রশস্তি মিলবে না। তিনি যে চানই না ভক্তের কানে অর্ধসত্যের সহজ মন্ত্র দিয়ে সহজ জয়ধ্বনির সস্তা নগদবিদায়। তাঁর আবির্ভাব এ-যুগে একটা অঘটন, যদিও অঘটন ব'লেই দৈনন্দিনতার ঘটক যাঁরা তাঁরা চান না তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকসাধারণের ঘটকালি করতে। কেন চান না?—এই জন্যে যে, তাঁর বাণী পালন করতে হ'লে শুধু যে অনেক কিছু ছাড়তে হয় তাই নয়, বিনম্র জিজ্ঞাসুর মতনই বিনতির দীক্ষা নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যবরণার্থী হ'য়ে তবে আসতে হয়—নৈলে তাঁর নববাণীবিগ্রহের পূর্ণায়তকান্তির সবটা চোখে পড়া অসম্ভব, কানের ভিতর গেলেও মরমে পশে না এ-আবির্ভাবের বহুমুখী দাবি—কর্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, আত্মনিবেদনে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় তর্ক নয়—প্রণাম।

এই সব কারণে আমার মনে হয় তাঁর বিশেষ ক'রে যোগ সম্বন্ধে সহজ ঢঙে দুচারটে কথা বলতে যাওয়ার মধ্যে বিপদও কম না। প্রধান বিপদ এই যে জনসাধারণের কাছে মনরাখা কথা বলতে গেলে তাঁর বাণীবিগ্রহের সত্যস্বরূপের মন রাখা হবে না। কেন হবে না সেটা বুঝতেই পারছ: গোড়ায়ই যেটুকু উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন প্রাঞ্জল ভাষায়ই যে

তাঁর পূর্ণযোগকে (integral Yoga) গ্রহণ করতে হবে শুধু মন দিয়ে তো নয়—আত্মা, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, ইচ্ছাশক্তি, প্রাণশক্তি সবকিছু দিয়ে যে। সবাই জানে, যা হাতে কলমে ক'রে তবে বোঝা যায় তাকে কাগজে কলমে বোঝানো এক দায়। এ-ধরণের ব্যাখ্যা অসম্ভব বলছি না, বলছি এর সার্থকতা আংশিক: শ্রীঅরবিন্দের যোগ পুরোপুরি বোঝা যায় না—যদি তাঁর যোগের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষ অনুভব না থাকে।

কিন্তু তবু আমি নিজেকেই প্রতিবাদ করব যে এভাবে তাঁর যোগ যারা করেনি তাদের জন্যেও এমন কি তাদের জন্যেই—এ-ধরণের আংশিক প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার উপমা মনে পড়ছে:

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খ'সে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলি ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে।"

কথাটা সত্য। ওদেশে বিজ্ঞানে যে-শ্রদ্ধার ছোঁয়াচ শেষটায় এমন কি গণমনেও লেগেছে তার ফলে বিজ্ঞানচর্চার একটা অনুকূল আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছে বৈ কি। তাই গুরুপাক বিজ্ঞানতত্ত্বকে লঘুপাক ক'রে, ডাইলিউট ক'রে পরিবেষণ করতে যাওয়ায় বিপদ আছে একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে মাত্রাজ্ঞান পাককৌশল জানলে এ পরিবেষণে সুফল ফলবার সম্ভাবনাও সমূহ। তেমনি শ্রীঅরবিন্দের অতলস্পর্শ যোগবাণী সময়ে সময়ে দুরবগাহ মনে

হ'লেও পুণ্যস্নানার্থীদের কাছে সে-তীর্থসলিলে অবতরণ করার প্রয়োজন আছে, এমন কি এর ফলে যদি প্রায়ই হাবুডুবু খেতে হয় তাহ'লেও। খোশ-খবরের ঝুটাও ভালো এ প্রবচনটি পুরো সত্য না হ'তেও পারে, কিন্তু ভালো জিনিসের ক্ষণিক ছোঁয়াচও 'ভালো এ-কথার মার নেই। তাছাড়া এ-জাতীয় কথকতা বিজ্ঞানের সম্বন্ধে পপুলার লেখার মতনই একটা শ্রদ্ধার পরিবেশ গ'ড়ে তোলে শ্রদ্ধালুদের মনে একটা সুন্দর গ্রহিষ্ণুতা ও বিনতির আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে। মেকি আধ্যাত্মিকতার মেকিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে চাই ভালো কথা—কিন্তু খালি ঐ সবই শোনা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুদের মানস স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়—কেন না এতে ক'রে জাতীয় মনে খাঁটি আধ্যাত্মিকতার 'পরে শ্রদ্ধাকেও অঙ্কুরেই বিনাশ করা হ'য়ে থাকে। পরমহংসদেব বলতেন না—মন ধোপা-ঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল? সত্যসন্ধানের অজুহাতে ক্রমাগত অধ্যাত্মজগতের ব্যভিচার ও বিকৃতির কথাও অহরহ ভাবতে ভাবতে এমন কথা জাতীয় মনে চারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের আধ্যাত্মিকতার বুঝি ষোলো কড়াই কানা। এই শ্রেণীর মনোভাব বড় সর্বনেশে কেন না এরই ফলে মানুষের মনে আধ্যাত্মিক মূল্যজ্ঞানের মূল দৃষ্টিই হ'য়ে আসে ঝাপসা। অমুক অতিবুদ্ধি পুঁথিপণ্ডিতের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যঙ্গ স্মরণ করো: "His ignorance of spiritual values is amazing".

তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে—যোগী শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে—

কিছু লেখা যে দরকার এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মনের পুরো সায় আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল লিখবে কে? Who is to bell the cat বলে না? উপমাটা সুপ্রযুক্ত—কেন না গোড়ায়ই গেয়ে রেখেছি একাজে বিপদ আছে। তাই অনেক দিন ধ'রেই আমি বাংলা জ্ঞানপ্রকাশের জগতে খুঁজেছি এমন লেখককে যিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগের সুব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কিন্তু ইংরেজিতে দুএকটি সুব্যাখ্যা আমার চোখে পড়লেও বাংলায় এ যাবৎ চলতি প্রাঞ্জল ভাষায় কোনো সুব্যাখ্যা আমার চোখে পড়ে নি। মানে এমন ব্যাখ্যা যা মন টানে—আমার "সু" উপমাটি লক্ষ্য কোরো।

হঠাৎ সেদিন "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা" বইখানি হাতে পড়ল। বইটি সদ্যোজাত— ১৯৪১ সনে আগস্ট মাসে বেরিয়েছে। প'ড়েই মনে হ'ল তোমার পত্রের কথা। তাই ঝটিতি লিখছি তোমাকে: যদিও আসলে তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁদের জিজ্ঞাসু মনকেই লক্ষ্যবেধ করতে চাই যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি সুব্যাখ্যা চান। এ-বইটির লেখক অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী নিশ্চয়ই এ-ব্যাখ্যার একজন যোগ্য লোক—সুযোগ্যতমদের একজন। তাই এবইটি সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলব সংক্ষেপে। সংক্ষেপে বলার এখন সুবিধা এই যে বইটা বেরিয়ে বাহুল্যবিস্তারের প্রয়োজন কিছু কমেছে।

সচরাচর ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাখ্যাকাররা কী করেন অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আনাতোল ফ্রাঁস কোথায় একবার

বলেছেন যে পাঠক প্রতি বইয়ে তা-ই পড়েন যা তিনি পড়তে চান। ব্যাখ্যাকারদের সম্বন্ধে যে এ-কথা আরো বেশি খাটে, না জানে কে? শঙ্কর গীতার ভাষ্য করবার সময়ে কর্মকে বুঝলেন এক রকম, শ্রীধর স্বামী বুঝলেন আর এক রকম, মধুসূদন সরস্বতী আর এক রকম। প্রত্যেকেই নিজের নিজের থিওরি চাপালেন বেচারি গীতার স্কন্ধে।

এটা খানিকটা অপরিহার্য—বিশেষ যদি ব্যাখ্যাকাররা নিজে এক একটি নধর বা উগ্রমত পোষণ করেন, যা ছাড়তে তাঁদেরকে বাজে। কে না জানে বলো যে আমাদের খুব বদ্ধমূল আইডিয়াগুলি—আগে-থাকতে-গ'ড়ে-ওঠা ধারাগুলি প্রায়ই আমাদের বুদ্ধিকে রঙিয়ে তোলে?

কিন্তু এই সব আগে-থাকতে-গ'ড়ে-ওঠা ধারণাদের (preconceptions) প্রভাব খানিকটা কাটিয়ে কোনো অনন্যতন্ত্র ভাবুকের ভাবরাজ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য হ'লেও যে দুঃসাধ্য নয় এ-সত্যের আংশিক প্রমাণ মেলে হরিদাস বাবুর বইটিতে। "আংশিক" বিশেষণটিকে পাশ কাটিয়ে যেও না, কারণ একথা সত্য হ'লেও, শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের ভাবরাজ্যের পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করতে গেলে ভাষ্যকারকে শ্রীঅরবিন্দের চেতনায় পৌঁছতে হবে—কি না শ্রীঅরবিন্দ হ'তে হবে—কিন্তু তা ব'লে একথা সত্য নয় যে তাঁর ভাবরাজ্যের ছিটে ফোঁটাও একেবারে ব্যর্থ। বলেছি বড় ভাবের একটু আধটু ছোঁওয়াও বাঞ্ছনীয়—ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা। তাই এ-ধরণের ব্যাখ্যা সুব্যাখ্যা হ'লে তার

নানান্ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের ভাবরাজ্যের একটা working knowledge—সত্যিই কাজে-আসে-এমন-জ্ঞান—দিতে পারে বৈকি। আর মনে রেখো যে ব্যাখ্যা যখন পড়ি তখন ব্যাখ্যা-কারেরএই পারাটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। নৈলে তাঁর যে-যোগের সাধনতত্ত্বের পাঠ দিতে স্বয়ং যোগিরাজকে "Synthesis of Yoga"-এর মতন মহাভারত লিখতে হ'ল—যার ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে Life Divine-এর মতন গ্রন্থের তিনটি সুপুষ্ট খণ্ডের প্রয়োজন হ'ল, সে-যোগের কোনো তনুমধ্যা ব্যাখ্যাদেবীকে ভাষার চাতুরীকটাক্ষে করায়ত্ত করা যে সম্ভব নয় এ বলাই বেশি।

কিন্তু ঠিক এই জন্যেই যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিশ্বাসযোগ্য একটা বর্ণপরিচয় গোছের চান তাঁদেরকে বলা চলে এ-বইটির আশ্রয় নিতে—অর্থাৎ যাঁরা মূল গ্রন্থের সিন্ধুমন্থন করতে অক্ষম। কিন্তু মনে রেখো, বলা যে চলে তার একটা প্রধান কারণ এই যে গ্রন্থকার শুধু যে পণ্ডিত ও মেধাবী তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দের যোগপ্রবেশে তাঁর একটি সহজ অধিকার আছে। আছে ব'লেই তিনি তাঁর ঐ আগে-থাকতে-গ'ড়ে-তোলা ধারণাগুলির ছোঁয়াচ বর্জন ক'রে শ্রীঅরবিন্দের যোগ একটু অব্জেক্টিভ ভাবেই দেখতে সক্ষম হয়েছেন। দু-একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন ধরো—

গ্রন্থকার শ্রীঅরবিন্দের "পূর্ণযোগের সাধন প্রণালী" অধ্যায়ে যেখানে লিখছেন :

"আধুনিক যুগে মানবতার ধর্ম (Religion of Humanity) চিন্তানায়কদের মন খুব আকৃষ্ট করিয়াছে। মানুষের কর্মজীবনকে

একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিবার এবং তাহার কর্মধারাকে একটা নূতন খাতে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানবপ্রেম বা বিশ্বমানবের সেবা বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ, পাশ্চাত্য জাতির কর্মধারা এই আদর্শের যতই বিপরীতমুখী হউক না কেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—ইহাই বর্তমান যুগের মূল মন্ত্র।

"কথাটা মহাসত্যের অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার কদর্থই হইয়া থাকে বেশি। যদি আমরা উপলব্ধি করি যে মানুষ ভগবানেরই অভিব্যক্তি এবং ভগবৎলীলার কেন্দ্রস্থল, আর তাহাকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে ভগবানের পূর্ণতম আত্মপ্রকাশ সম্ভব, তবে নিশ্চয়ই বলিব 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। কিন্তু যদি মনে করা যায় (প্রতীচী তাহাই মনে করে) দেহমন-প্রাণের সাময়িক সংঘাটরূপে যে-মানুষকে আমরা স্থূলভাবে প্রত্যক্ষ করি সেই মানুষই সবার উপরে সত্য, ভগবান্ বলিয়া অন্য কোনো সত্তা নাই, মানবীয় বৃত্তিগুলির সম্যক্ উন্মেষ-সাধনই এবং মানুষের সুখসম্ভোগের চরম পরিবর্ধনই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তবে তাহা অজ্ঞানেরই নামান্তর। মানুষ সবার উপরে সত্য কারণ মানুষের অন্তরে ভগবান্ বিরাজ করেন, এবং সেই ভগবানের ঐশ্বর্যকে বাহিরে ফুটাইয়া তোলাই তাহার জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। এই মহাসত্য বিস্মৃত হইয়া আমরা মানুষকে যখন শুধু মানুষরূপেই দেখি, অন্ধ হৃদয়াবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বমানবকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হই, তখন

আমাদের অহংবুদ্ধি একটা বিশাল প্রসার লাভ করে বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না। এই মানবপ্রেম কখনও যোগের অঙ্গ হইতে পারে না, এবং বিশ্বমানবেরও চরম কল্যাণের হেতু হইতে পারে না।"

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হ'য়ে গেল—কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। কারণ আমাদের গড়পড়তা অর্ধজ্ঞানপ্রবণ মনে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের পূর্ণজ্ঞানের শ্যামনাম যে "কানের ভিতর পশিলেও" প্রায়ই "মরমে পশিতে পায়" না ব'লে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করেছ তার একটা জবাব মিলবে এইখানেই, আর কথাটা একটা বড় কথা। হয়েছে কি, শ্রীঅরবিন্দ বিপুল জৈবলীলাকে আধুনিক পরহিতৈষণা (altruism) বা আন্তর্জাতিকতার আখড়া হিসেবে দেখেন নি—দেখেছেন ভগবানের লীলা ও বিভূতির ক্রমপ্রকাশপ্রাঙ্গণ হিসেবেই। এ-যুগে প্রায়ই দেখবে আধ্যাত্মিক সত্যকে মানবিকতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে হুকুম করা হয়—বিশেষত পাশ্চাত্য দেশে—

"বাপুহে, প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, অর্থাৎ আমাদের হাল আমলের নরনারীর কাছে যদি কল্‌কে পেতে চাও তবে তিন সত্যি করো যে তোমার সব ঢেউ এসে শরণ চায়, বরণ চায়, মরণ চায় শুধু এই মানবিকতার অপ্রশস্ত সরোবরে। ভালো চাও তো হলপ করো বলছি যে তোমার যেসব অনুভূতি উপলব্ধি দৃষ্টি ধ্যান ছোঁয়াছুঁয়ি মানবিকতার কাজে না আসবে তাদের তুমি যে শুধু নাকচ করবে তাই নয়, তাদের সঙ্গে বেশি কারবার যে-ই করবে তাকেই একঘরে করবে

সেকেলে ব'লে, কানপাতলা ব'লে, সমাজশত্রু (anti-social) ব'লে।"

কিন্তু ওদেশ বললেও ভারত কোনো দিনই বলে নি একথা—যদিও এ-যুগের বিশ্বমানবিক দরদীরা সবাই ভারতের বেদ বেদান্ত দর্শন তন্ত্রমন্ত্রে এই আধুনিক humanist humanitarian ভাষ্য করতে গিয়ে ডুবেছেন।

ডুবেছেন কথাটা ভুল বুঝো না। আমি একথা বলছি না যে এসব মানবিক বৃত্তির কোনো সার্থকতাই নেই। বিশ্বলীলায় এরা আমাদের চেতনার আরোহণে এক একটা ধাপের কাজ করে এটুকু বললে আপত্তি করার কিছু থাকে না। তর্ক ওঠে তখনই যখন শুনি যে এই বৈশ্বমানবিকতা-দেবীই হ'লেন এ-যুগের একমাত্র কল্পতরু, গভীরতম সত্য হ'ল এই-ই, এবং (কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!) এই কথাই বলেছেন বৈদিক ঋষিরা—আবহমানকাল !!

কোথাও বলেন নি। বলা হয়েছে বটে যে "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" (বিশ্বকর্মা মহাত্মা বুকে বুকেই বিরাজ করেন)। কাজেই জীবে শিবজ্ঞান ভাগবত চেতনার একটি মূল উপলব্ধি, বটেই তো। কিন্তু তাই ব'লে এ ঠিকে-ভুল করা চলবে না যে এহেন বিশ্বকর্মা মহাত্মার উপলব্ধির পরে শিবজ্ঞানে জীবসেবা আর মানুষকে মানুষ ব'লে তার উপকার করতে ছোটা এদুয়ের ভিতরকার ছন্দ অভিন্ন। কারণ সাধারণত যে-পরোপকারের গুণগানে আমরা পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠে থাকি একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবে যে তার স্থান স্বার্থমগ্ন জীবনের

উপরে হ'লেও তার মূল প্রেরণাটা অহংবুদ্ধিই বটে—কি না, আমি পরের উপকার না করলে জগন্নাথের রথ চলবে কার টানে? এই জন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "দান ও পরোপকার প্রায়ই অহং-বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে থাকে···এমন অনেক মানবহিতৈষী দেখা যায় যাঁরা ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবেন যদি আমাদের অশেপাশে গরিবদুঃখীরা চিরদিন না থাকে—কেন না তাহ'লে তাঁরা উপকার করবেন কাদের?"*

আমাদের বৈদিক ঋষিরা একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদ্রষ্টারা যে-মন্ত্রের দীক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন কান পেতে যদি শোনো তো শুনতে পাবে যে সে-মন্ত্রের মধ্যে এই **altruism** বা **charity**-র সুর কোথাও আধুনিক **humanist-humanitarian** সুরে বেজে ওঠে নি। তাই তাঁরা "বিশ্বাধিপকে" "সর্বভূতেষু গূঢ়" বা "সর্বভূতান্তরাত্মা" বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন যে সব আগে চাই তাঁকে জানা—যদি মৃত্যুলোক উত্তীর্ণ হ'য়ে অমৃতলোকের ছাড়পত্র পেতে হয়:—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—" এছাড়া জীবনের পরমার্থ-লাভের আর পথ নেই, থাকতে পারে না—এ তাঁরা বলেছেন অগুন্তিবার।

*** But even charity and altruism are often essentially egoistic in their immediate motive...There are philanthropists who would be troubled if the poor were not always with us, for they would then have no field for their charity.... (VIEWS AND REVIEWS, P. 19, 20)**

কিন্তু মুশকিল কি জানো? মুশকিল হচ্ছে উপকার করব বলা যত সহজ করা ঠিক তত সহজ নয়। এইটেই আমাদের মুনিঋষিরা বুঝেছিলেন: অর্থাৎ বুঝেছিলেন যে পারমার্থিক জ্ঞান বিনা যথার্থ স্বার্থসন্ধানও হয় না। একটু চোখ খুলে দেখলে একথা দেখতে পাবে স্পষ্টই, চোখে পড়বে তখন এই বিচিত্র স্বতোবিরোধটি যে, "জগদ্ধিতায়" যাঁরা সব চেয়ে বেশি ছোটাছুটি ক'রে বেড়ান তাঁরাই সব চেয়ে ব্যর্থকাম হন জগতের কোনো স্থায়ী হিতসাধন করতে—আর যাঁরা আগে বিশ্ব ডিঙিয়ে বিশ্বকর্মাকে লাভ করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বিশ্ববন্ধু হ'য়ে থাকেন। তাই তো বৈদিক ঋষিরা পই পই ক'রে মানা করেছেন বন্ধনকে মেনে নিতে, বলেছেন অমৃতকে ছুঁয়ে অমৃত হ'য়ে তবে বিশ্বকে শোনাতে যে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য-বর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ"—তমসার পারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমরা জানি—তোমরা শোনো তাঁর কথা—নৈলে তোমাদের হবে মহতী বিনষ্টিঃ। কাজেই একথা বললে অন্যায় হবে না যে সর্বভূতে ভগবানকে দেখে যাঁরা "সর্বভূতহিতে রতাঃ" থাকেন তাঁদের আত্মারাম জীবন্মুক্ত ছন্দের সঙ্গে আধুনিক সমাজহিতৈষী বা দেশ-ভক্তদের বহির্মুখী হিতৈষণার ছন্দের মিল থাকার কথা নয়। আরো, এটুকু না বুঝলে হবেই হবে গোড়ায় গলদ—আধ্যাত্মিকতার মূল্য-জ্ঞানের তছনছ। যথার্থ আধ্যাত্মিক চেতনার গোড়াকার কথা তো তার অধ্যাত্ম-অনুভূতির industrial application নয়, শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জীবনের ঐকান্তিক লক্ষ্য হ'ল ভগবানে আত্মসমর্পণ। এমন কি খৃষ্টও এই কথাই বলেছিলেন, যেমন ধরো যখন জনতা

তাঁকে বলল দেখ, তোমার মা ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে—তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন খৃষ্ট ব'লে উঠলেন: "আমার ভাই! আমার মা! কে তারা?…স্বর্গে আমার যে-পিতা আসীন তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী যারা তারাই আমার ভাই-বোন বাপ-মা।"*

খৃষ্টের কথা তুললাম আমি ইচ্ছে ক'রেই। কারণ বাইব্‌ল্‌টা মন দিয়ে পড়লে দেখা যায়—যদি অবশ্য তথাকথিত হিতৈষণার একপেশো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখা যায়—যে ঋষিদের মতন খৃষ্টও বরাবরই সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন ভগবানের আদেশের 'পরে। তাই তিনি বারবারই দুঃখ করেছিলেন যে ভাগবত পরোয়ানা নিয়ে যারা আসে তাদেরকে অজ্ঞান মানুষ মানে না, মানে তাদেরকে যারা স্ব-স্ব-প্রধান; বারবারই জানিয়েছেন যে প্রার্থনীয় হ'ল এই মন্ত্র: "Our Father which art in heaven, hallowed be thy name"—"স্বর্গাসীন পিতার নামই পুণ্যনাম ব'লে গণ্য হোক"; বারবারই বলেছেন: "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind···And call no man your father upon the earth: for one is your father which is in heaven."†

* "Who is my mother? and who are my brethren?...For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother." (ST. MATTHEW—12/50)

† "ভগবানই তোমাদের প্রভু তাঁকেই ভালোবাসবে সর্বান্তঃকরণে—মনে প্রাণে…এ-জগতে কাউকে পিতা ব'লে ডাকবে না—কারণ তোমার পিতা কেবল একজন—যিনি স্বর্গে আসীন।"

আশা করি তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ আমি এসব কেন বলছি এত ক'রে। আমি এ সূত্রে দেখাতে চেয়েছি যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিৎরা আবহমানকাল পরমার্থকে দেখেন নি ঐহিকতার তাঁবেদার হিসেবে—উল্টো দিকেই তাঁদের ঝোঁক পড়েছে—সর্বদেশে, সর্বযুগে। কিন্তু হাল আমলে—বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানবুদ্ধির অভ্যুদয়ের পর থেকে—যখন শুধু জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়জগৎ-ই হ'য়ে উঠল মানুষের যথাসর্বস্ব, তখন অধ্যাত্ম সাধনার মূল দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই নাকচ করার প্রবণতা প্রবল হ'য়ে উঠল আধুনিক বিশ্বমানবতার উচ্ছ্বাসলোকে। শ্রীঅরবিন্দকে তাই বলতেই হ'ল যে জড়বাদ ও ঐহিকতার মধ্যে সত্য থাকলেও ভাগবত সত্যের প্রামাণিকতার পরীক্ষা হ'তে পারে না তার কোনো ঐহিক লক্ষ্যসিদ্ধির আশু বিচারে, কাজেই পূর্ণযোগ হ'তে পারে না একান্ত মানবলক্ষ্য। তিনি এই কথাটি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায়: যে, "বিশ্বমানবের কাজে আসতেই হবে, এ-ধরণের গোলমেলে কথার আমদানি হয়েছে পশ্চিম থেকে: এর বাণী হ'ল আসলে ধারকরা। বিশ্বমানবের কাজে আসার জন্যে যোগের কোনো দরকারই নেই, যেহেতু যে কেউ যে কোনো ক্ষেত্রে যা কিছু করুক না কেন বিশ্বমানবের কোনো না কোনো কাজে আসেই আসে।"

না—বলছেন তিনি—"যোগের লক্ষ্য ভগবান—বিশ্বমানব নয়।" বন্ধুবর অতিমানস অবতরণের কথা তুলেছিলেন ব'লে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আরো: "অতিমানস চেতনা যদি নামে ও মর্ত্যলোকে

প্রতিষ্ঠিত হয় তাহ'লে অবশ্য মর্ত্যলোকের অনেক ছন্দবদল হবে—মর্ত্য-জীবনেরও। কিন্তু মানুষের জীবনে সে-অবতরণের দরুণ যে-তোলপাড় আসবে সেটি হবে তার একটি আংশিক ফল মাত্র—আমাদের যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে সে গণ্য হ'তে পারে না। পূর্ণযোগের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে পারে শুধু দিব্য চেতনায় বিধৃত হওয়া এবং তাকে জীবনে প্রকাশ করা।"*

এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে—যে তাই যদি হয় তাহ'লে এ-জগতের কী দরকার ছিল?

এ-প্রশ্নের উত্তর শ্রীঅরবিন্দ বহুবার দিয়েছেন তাঁর বহুমুখী জীবনজিজ্ঞাসায়। তার গোড়াকার কথাটা এই যে এ-জগতে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করতে হবে তাঁরই অনুজ্ঞায় তাঁকে উপলব্ধি ক'রে—তাঁকেই আত্মসমর্পণ ক'রে। প্রেম বলো কর্ম বলো জ্ঞান বলো সবই পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে ওঠে তাঁকে পেলে তবেই—

*The idea of usefulness to humanity is the old confusion due to second-hand ideas imported from the West. To be useful to humanity there is no need to do Yoga. For everybody who lives the human life is useful to humanity in one way or another... Yoga is directed towards God, not towards Man. If a divine Supramental consciousness and power can be brought down and established in the earth, that would obviously effect an immense change in the earth including humanity and its life, but this effect on humanity will be only one result of the change, it cannot be the whole object of our Yoga. The whole object of our Yoga can only be to live in the divine consciousness and manifest it in life.

নৈলে নয়। বারবারই তিনি বলেছেন যে, ভগবানকে বাদ দিলে যা-ই করো না কেন অকৃতার্থই থেকে যাবে—আমাদের নশ্বরতা শুভদা বরদা হবে কেবল তখনই যখন আমরা অমৃত হব তাঁতে তন্ময় হ'য়ে। আর এই-ই হল আমাদের একটি পরম ও চরম আপ্তবাক্য :

যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ।*

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে অবশ্য এছাড়াও আরো অনেক কথাই বলেছেন—আগেকার দ্রষ্টারা যা দেখেছিলেন সেইখানেই যে সত্যদৃষ্টির মহাসমাপ্তিপর্ব একথা কদাপি মানেন নি। তিনি বরাবরই ব'লে এসেছেন যে, আমাদের আগেকার উপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখরকেও ছাড়িয়ে গিয়ে—সর্বোত্তম আনন্দরাজ্যেও উত্তরোত্তর প্রসার চাইতে হবে।

কিন্তু সে হ'ল পরের কথা। সব আগে শ্রীঅরবিন্দের মূল মন্ত্রের এই কথাটি মনে ছ'কে নিতে হবে যে ঐহিক জীবন বিধৃত পরমার্থেই। মনে রাখতে হবে যে, এখানে তিনি "পূর্বদেব ও ঋষিদের" সুরেই সুর মিলিয়ে তাঁর নবতন আবিষ্কারে পেয়েছেন সেই শাশ্বত মন্ত্রসাধনারই মৃত্যুহীন প্রস্বন যে, "Our mortality is only justified in the light of our immortality; our earth can know and be all itself only by opening

* আমাদের আগের দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে জেনে তাঁতে তন্ময় হ'য়ে তবেই অমৃত হয়েছিলেন। (শ্বেতাশ্বতর)

to the heavens ; the individual can see himself aright and use his world divinely only when he has entered into greater planes of being and seen the light of the Supreme and lived in the being and power of the Divine and Eternal."

"মরতা হবে বরদা—যে-সুদিনে
মানব তার আপন আলো-অমৃতে লবে চিনে।
অন্ধকার অবনী তার স্বরূপে অমলিন
স্বয়ং-প্রভা হবে শুধু—যেদিন
অন্তরে সে জানিবে তার যা-কিছু জানিবার।
সেদিন ধরা মেলিবে দল তার
কমলসম অমরাবতী পানে
পরমতম নীলিমা তাঁর অঙ্গীকারি' প্রাণে।
ভুবনে নর দিব্যলীলা করিবে বীতশোকে
লভিবে ঠাঁই উচ্চতর চির-চেতনা-লোকে—
যেথা সে প্রেম-চিন্ময়ের আনন্দ-প্রভাতী
নয়নে করি' বরণ হবে শরণে তাঁরি সাথী—
মিলনে তাঁরি শক্তি লভি' জীবনে হবে জয়গরবী
স্বপনসুখে কিরণ কবি আঁধার করি' আলা
জীবনডোরে গাঁথিয়া তাঁরই মন্ত্রমণিমালা।"

এ-কথাগুলি ব'লে ভালোই হ'ল। আরো এই জন্যে যে হাল আমলে অন্তরের এই সব অমৃতবাণীকে বিচার করা হয়

তার কয়েকটা বাহ্য প্রকাশের যাচাই দিয়ে। এভাবে শাশ্বত অমৃতমন্ত্রদের সত্যমূল্য-নির্ধারণ যে হ'তেই পারে না একথা যোগী শ্রীঅরবিন্দের বহু উজ্জ্বল খণ্ডনের স্বাক্ষরেই আমরা পাই। কিন্তু পেলে হবে কী? নিতে না চাইলে? আর নিতে না-চাওয়া মানেই তো বুঝতে না-চাওয়া—তাঁর যোগদীক্ষার পরম বাণীটি কী। এ-মনোভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সাধনসত্যকে বুঝতে গেলে দুর্বোধ্য লাগবে না?

কিন্তু হরিদাস বাবুর বইটি পড়লে বুঝতে পারবে যে সরল জিজ্ঞাসুর ভঙ্গিতে জানতে চাইলে শ্রীঅরবিন্দের যোগতত্ত্বের সব না হোক অনেক কিছুই সুবোধ্য মনে হয়। তাই তো বলছিলাম যে এ-ধরণের বইয়ের আত্মপ্রকাশ এ-যুগে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। "বিশেষ" বললাম এই জন্যে যে, এ-যুগে আমাদের গ্রহণরীতির ভঙ্গি এত বদ্‌লে গেছে যে অধ্যাত্মপথেও আমাদের বিচারবুদ্ধির খানিকটা সায় না পেলে আমরা কেমন যেন স্বস্তি বোধ করি না। কেন না যদিও আমাদের গভীরতম বিকাশের পথে বাতি ধরতে পারে এক অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলো, তবু—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—এ পথেও "মানস চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির সমর্থনের মূল্য যথেষ্ট থাকে। এমন মানুষ দেখা যায় বটে যাঁরা আন্তর সত্যলোকের সঙ্গে নিবিড় অপরোক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারেন, তাঁরা পারেনও উপলব্ধি অন্তর্দৃষ্টিকে নিয়ে বেশ সুখে ঘর করতে—কিন্তু তবু সব জড়িয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে গেলে বুদ্ধিকে আমল না দিলেই নয়। সর্বোত্তম সত্য যদি হয় আধ্যাত্মিক, তাহ'লেও বুদ্ধির

জানাশোনা হওয়া চাই সেই আদিম সত্যের সঙ্গে, বোঝা চাই তার সঙ্গে জৈবলীলার সম্বন্ধটি কী। অধ্যাত্ম সত্যের সঙ্গে বুদ্ধি আমাদের মুখোমুখি করিয়ে দিতে পারে না বটে, কিন্তু সহায় হ'তে পারে সে-সত্যের একটা মানস ছক-কাটার কাজে—এই সূত্রে মনের কাছে তার যাথাতথ্যকে প্রাঞ্জল ক'রে দিয়ে। বুদ্ধিকে এভাবে সোজাসুজি সন্ধানের দিকে নিয়োগ করা যেতে পারে বৈ কি : আর এ-সহায়তার মূল্যও খুবই বেশি।"*

তাই একথা অকুতোভয়েই বলা চলে যে বুদ্ধির হাজারো দোষত্রুটি থাকলেও শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মবাণীকে তার বোধগম্য ভাষায় তর্জমা করাটা হবে একটা কাজের মতন কাজ—বিশেষ ক'রে যদি তাঁর গভীর বাণীর কিছুও মাতৃভাষার দৌত্যে আমাদের প্রাণমহলে পৌঁছে দিতে পারা যায়।

---

*...but the support of the reflective and critical reason is also of great importance; if many can dispense with it, because they have a vivid and direct contact with inner realities and are satisfied with experience and insight, yet in the whole movement it is indispensable. If the supreme truth is a spiritual Reality, then the intellect of man needs to know what is the nature of the original Truth and the principle of its relations with the rest of existence, to ourselves and the universe. The intellect is not capable by itself of bringing us into touch with the concrete spiritual reality, but it can help by a mental formulation of the truth of the Spirit which explains it to the mind and can be applied even in the more direct seeking: this help is of capital importance. (LIFE DIVINE—VOL. II—PP 890-91)

হরিদাস বাবুর বইটিতে এই লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে ব'লেই মনে হয় যে বইটি আমাদের বাঙালি পাঠকপাঠিকার কাছে বিশেষ আদরণীয় হ'য়ে উঠবে। অন্তত যাঁরা অন্তর্জীবনের তত্ত্বজ্ঞ হ'তে চান—শুধু তথ্যজ্ঞই নয়—তাঁদের কাছে। কেননা এ-বইটির একটি প্রধান গুণ এইখানেই যে অন্তর্দৃষ্টির আলো গ্রন্থকারের স্বচ্ছ বুদ্ধির উজ্জ্বল অঙ্গীকারে এর ছত্রে ছত্রে নির্মেঘ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

"পূর্ণযোগী যখন শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শনের ভূমিতে আসিয়া কাজ করেন তখন সৃষ্টির অপূর্বতায় সত্যদৃষ্টির অভাবনীয় গভীরতায় নবযুগের প্রবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু সেইজন্য শিল্প সাহিত্য প্রভৃতিকে অপরিবর্তিতভাবে যোগের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পূর্ণযোগী সঙ্গীতচর্চা করিবেন অথবা সাহিত্যসেবা করিবেন, সাহিত্যরসে অথবা সঙ্গীতের আনন্দে ডুবিয়া থাকিবার জন্য নহে, ভগবানের নিকট উৎসর্গ করিয়া ভগবানেরই সেবা বা উপাসনারূপে।"

তোমার হয়ত মনে হতে পারে এ তো অধ্যাত্মবিদ্যার্থীরা সবাই জানেন। কিন্তু অধ্যাত্মপ্রবেশে শুধু উপর উপর জানলেই তো হবে না ভাই! (বলতে কি, জানা হ'ল দীক্ষার প্রথম কথা—বর্ণপরিচয়। তার পরের কথা হ'ল মানা—অভিনিবেশ। তারও পরের—প্রাণ টানা—আত্মসমর্পণ।) তাই অধ্যাত্মবিদ্যার্থীরা অনেকেই এটা লোক-মুখে শুনে এলেও এটা তাঁরা জেনেছেন খানিকটা তথ্য হিসেবে—অর্থাৎ অধ্যাত্মতীর্থযাত্রীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকমই হ'য়ে

এসেছে এই জনশ্রুতির স্বাক্ষরে। শ্রদ্ধা যাঁদের কাছে সহজ তাঁদের পক্ষে এই জনশ্রুতি বা আপ্তবাক্যকে গ্রহণ করাও একটু সহজ হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাহ'লেও এটা হ'ল পথচলার মাত্র পয়লা ধাপ। এর পরের ধাপ হ'ল মানা—recognition—যে মর্ত্য-জীবন-তরুর মূল হ'ল ঊর্ধ্বাশ্রয়ী—আর "তাঁকে যে-ই জেনেছে সে-ই অমৃত হয়েছে।" কিন্তু অমৃত যে শুধু তিনি এটুকু জানলে কিংবা মানলেও চলবে না তো: "So long as one is satisfied with looking through windows, the gain is only initial; one day one will have to take up the pilgrim's staff and start out to journey there where the Reality is for ever manifest and present."*

হরিদাস বাবুর বইয়ে এই তীর্থযাত্রার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথাই আছে, না থাকলে বইটির মূল্য এত বেশি হ'তে পারত না—হ'য়ে দাঁড়াত খানিকটা পুঁথিপড়া বুলিরই সামিল। বলেছি তাঁর একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে অধ্যাত্মসত্যে তাঁর যে শুধু মানসিক প্রবেশ আছে তা নয় আন্তর সায় আছে। তুমি জানো আমরা যখন কোনো ভালো বই পড়ি তখন লেখকের এই আন্তর সায়ই—sincerity—আমাদের অন্তরকে সবচেয়ে আকৃষ্ট

* শুধু ঘরে ব'সে জানলা দিয়ে অলস প্রেক্ষণে সত্যতীর্থের দিকে ঠায় চেয়ে খুসি থাকলে লাভটা কোনোদিনই শুরুর কোঠা পেরুবে না—একদিন না একদিন সবাইকেই লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে সেই নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যেখানে সত্যের সত্য নিরবগুণ্ঠ ও সদাসজাগ ("অনামী"-তে শ্রীঅরবিন্দের পত্র ৩০৭ পৃষ্ঠা)।

করে। কেন না মন মনকে টানে বটে, কিন্তু অন্তর সাড়া দেয় কেবল আন্তরিকতার ডাকে। হরিদাস বাবুর বইটির নানা ব্যাখ্যায় তর্পণে এই ডাকটি বেজে উঠেছে গভীর সুরেই: তিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগকে বুঝেছেন শুধু তাঁর মনের মনীষা দিয়ে নয়, প্রাণের তৃষ্ণা দিয়ে, অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে, সত্তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিনতি দিয়ে। আমি তোমাকে বারবারই বলেছি যে শ্রীঅরবিন্দের যোগে যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো পর্যন্ত তেমন ব্যাপকভাবে সাড়া দিতে পারেন নি এতে অত আশ্চর্য না হ'তে, কেন না শ্রীঅরবিন্দের যোগকে গ্রহণ করা বেশির ভাগ মনোজগতের বাসিন্দার পক্ষেই কঠিন আরো এই জন্যে যে শ্রীঅরবিন্দ যে-যোগ চাইছেন সেটা কোনো একটা বস্তুতান্ত্রিক অতিবুদ্ধির দলিল নয়, নয় কোনো ইস্‌ম্-বর্গীয় ধুমধড়াক্কা, এমন কি কোনো সর্বধর্মসমন্বয় বা সর্বতন্ত্রসার-সঙ্কলন জাতীয় পল্লবগ্রাহিতাও নয়—যার গালভরা নাম হ'ল eclecticism: এ-ধরণের কোনো মানস-স্বাক্ষরিত জুৎসৈ হাল ফ্যাশনের সহজ ব্যবস্থা দিলে উৎসাহী দীক্ষার্থীরা আসত বানের জলের মতন—"শ্রীঅরবিন্দজীকি জয়" বলতে বলতে। কিন্তু তিনি যে পেয়েছেন এক নব বাণী, নব মন্ত্র, নব সত্য—যার আবাহনে তাঁকে আজও সর্বত্যাগী তপস্যায় ব্রতী থাকতে হয়েছে কত নিন্দা কত কুৎসা, কত ভুলবোঝা, কত ক্ষত ও ক্ষতি স্বীকার ক'রে। তাঁর কাছে আমরা শুনেছি এর জন্যে কত তাঁকে সইতে হয়েছে, পর্বত-প্রমাণ বাধাবিপত্তিকে হয়েছে পেরুতে, করতে হয়েছে যুদ্ধ, সইতে হয়েছে ক্ষত ক্ষতি, কাঁটাবনে মরুকান্তারে চলতে হয়েছে পথ কেটে

—শুধু ভগবানকে আবাহন করতেই নয়—মানুষের মধ্যে যারা চাইল উর্ধ্বাভিসারের অগ্রদূত হ'তে তাদেরও প্রতিভূ হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে মানবতার পিছুটানকেও হ'য়েছে কাটাতে—শুধু হালকা লীলাখেলায় নয় ঐকান্তিকতার কঠোর পণে উপলব্ধি করতে হয়েছে এই সব বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতার পূর্ণ প্রতাপ—প্রতিহত হ'তে হয়েছে যে কতবার—ঠেকে তবে শিখতে হয়েছে এ পথে জয়লক্ষ্মীর প্রসাদ অর্জন করতে হয় কী অতন্দ্র সাধনায়, আর কত দাম দিয়ে।

তাই তো তিনি পেয়েছেন সেই দিব্যজ্ঞানের আলো যার অন্তরে দিব্যপ্রেমের অমৃত। নৈলে কি তিনি বলতে পারতেন (আমাকে লেখা একটি পত্রে): "অজস্র দাম দিয়ে তবে এ-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি ব'লেই তোমাদেরকে এত ক'রে বলি আজ: 'অন্তরকে দিশারি ক'রে রবিকরোজ্জ্বল পথেরই পথিক হ'য়ে চলো। জেনো ভগবান আছেন তোমাদের ধারণ ক'রে, তোমাদের সাথের সাথী হ'য়ে, কাল পূর্ণ হ'লেই দেখা দেবেন—দুর্গম কঠিন ঘোরালো পথে পা না-ই বা বাড়ালে।' "*

এই কথাই আমি বলেছি আমার "প্রেমী" প্রবন্ধে। কারণ এই যে-সুর শোনালাম তাঁর স্নিগ্ধ লিপির গভীর ঝঙ্কারে—এই যে

* It is because of our experience won at tremendous price that we can urge upon you and others : 'Take the psychic attitude ; follow the sun-lit path, with the Divine openly or secretly upbearing you—if secretly, he will show himself in good time—do not insist on the hard, hampered, round-about and difficult journey.'

সনির্বন্ধ অনুরোধ, শুভকামনা, নিজের সাধনার আলোয় অপরের পথ সুগম করবার আকাঙ্ক্ষা এর নাম তো শুধু জ্ঞানের দিঙ্‌নির্ণয় নয় ভাই—এরই নাম প্রেম—স্বার্থগন্ধহীন পরহিতব্রত প্রেমের পরম ছন্দ।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগের একটা মস্ত বাণীই হ'ল এই যে প্রেম প্রতিষ্ঠা পায় না জ্ঞানের বনেদ বিনা। কাজেই প্রেম চাইতে হ'লে জ্ঞানেরও সাধনা অপরিহার্য—যেহেতু জ্ঞানই দেয় সে-দৃষ্টি যে দেখতে পায় প্রেমের পথে কত অগুন্তি বাধা। এ-জ্ঞান যত ঊর্ধ্বতর লোক থেকে আসে বিশ্বরহস্যের ঘনান্ধকার তত ফিকে হ'য়ে আসে বটে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টি মেলে কেবল তখন যখন প্রকট হয় (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) অতিমানস—Supramental লোকের আলো। এ-সত্যের দিশারি শ্রীঅরবিন্দ নিজে: তিনি বলেন যে এর দিশা বৈদিক যুগের ঋষিরা কিছু কিছু পেয়েছিলেন—কিন্তু এ-যুগের মানুষ এর কোনো খবরই রাখে না। তিনি তাঁর অদ্ভুত সাধনায় এ-সত্যের দিশা তথা আদেশ পেয়েছেন কিন্তু এ-ও জেনেছেন যে এ-সত্যালোক প্রতিভাত হবার পথে এখনো বাধা আছে—যদিও এর অবতরণ অবশ্যম্ভাবী এ-কথা তিনি বারবারই বলেছেন তাঁর নিঃসংশয় প্রতীতির মন্ত্রমান্ ছন্দে। যাঁরা এ-সত্যের মর্মবাণীটি শুনতে চান তাঁদেরকে তাঁর লেখা পড়তেই হবে, কেননা শ্রীঅরবিন্দ শুধু যে অনন্যতন্ত্র মন্ত্রর্ষি তাই নয়, অনন্যতন্ত্র ভাষ্যকারও বটেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর বিবর্তনবাদের মূল ধারাটি ধরতে হ'লে তাঁর যোগলব্ধ এই অতিমানস তত্ত্বের

শিরোমণিত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতেই হয় সেহেতু এসম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে একটু আধটু লিখেই ক্ষান্ত হব, কেননা যদিচ মন দিয়ে একে ধরা-ছোঁয়া যায় না একথা শ্রীঅরবিন্দ বহুবারই বলেছেন—তবু বিশ্বলীলার একটা মনোগ্রাহ্য ছক কাটতে হ'লে এর কিছু হদিশ না দিলেই নয় বুঝে বুদ্ধির পরিভাষায় এ-তত্ত্বের যতটা আভাষ দেওয়া সম্ভব তিনি দিয়েছেন—তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল ভাষার অশ্রুতপূর্ব ছন্দে।

এসম্বন্ধে প্রথম যেকথা মনে রাখাই চাই সেটা এই যে অতিমানসসিদ্ধি শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের মুকুটমণি হ'লেও এ-সিদ্ধি হ'ল অনেক পরের কথা—সাধকদের এ নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও ক্ষতি নেই, যেহেতু অতিমানসসিদ্ধির জন্যে আকুলি বিকুলি না ক'রেও শ্রীঅরবিন্দের যোগে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তাঁর কাছে আমরা শুনেছি বারবারই যে ভাগবত জীবন বা ভগবৎ-মিলন অতিমানসসিদ্ধির আগেই হ'তে পারে। মানুষের চেতনার আরোহণকে তিনি যে দেখেছেন সমগ্র বিশ্বলীলার সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকায়। একথাটি হরিদাস বাবু তাঁর "দেশসেবা ও যোগ" নিবন্ধে বেশ পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। লিখেছেন: "বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই এক মহাযোগে নিমগ্না, আর সেই যোগই মানুষের সজ্ঞান সহযোগের মধ্য দিয়া রূপ গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ যোগে।" এর ফলে মানুষের চেতনার বিকাশ কোন্ পথে কী ভাবে হয় ধাপে ধাপে, হরিদাস বাবু আরো ফুটিয়ে তুলেছেন—তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। কেবল শেষের কথাটুকু উদ্ধৃত করি যেখানে তিনি বলেছেন:

"যেহেতু আত্মসমর্পণ শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল কথা, আমরা বলিতে পারি যে, এ-যোগ ভগবানের নিজেরই যোগ। ভগবান্ নিজেই এ-যোগের সাধক, নিজেই ইহার সাধ্য।" কাজেই এ-যোগে চেতনার ঊর্ধ্বগতি হয় ধীরে ধীরে এবং অতিমানসসিদ্ধির অপেক্ষা না রেখেই, দিব্যজীবনের গোড়া পত্তন হ'তে পারে। এক কথায়, ভাগবত জীবন অতিমানসসিদ্ধির অগ্রদূত। কিন্তু তাহ'লে স্বতই মনে ফের এই প্রশ্নের উদয় হয় যে এই অতিমানসসিদ্ধি ঠিক কী বস্তু? সুপ্রামেণ্টাল নামটা শুনেই পুঁথিপণ্ডিতদের কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি—"এ তো অতি সোজা কথা, উনি হচ্ছেন মেণ্টালের উপরওয়ালা কোনো এক উপাধ্যায়"—অর্থাৎ "যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আর কি।

কিন্তু এ-ধরণের সত্যপাঠের মধ্যে পাঠ থাকলেও সত্য ব'লে যাকে আমরা বরণ করতে চাই তার কোনো পরিচয়ই পাই না। কারণ শ্রীঅরবিন্দের কাছেই শুনেছি—মনের উপরওয়ালা তো একটি নয়—অনেকগুলি। এই সব স্তরের চলন বলন ধরণ-ধারণের বিশদ খবর দেওয়া এ-পত্রের উদ্দেশ্যও নয়—আমার সাধ্যেরও বাইরে—যদি জানতে চাও যেতে হবে তোমাকে শ্রীঅরবিন্দেরই কাছে। আমি এ-কথা তুললাম কেন বলেছি—শুধু একটা ছক কাটতে।

কেবল একটা কথা: মনাতীত স্তর একাধিক বলতে যেন ভেবে বোসো না যে এদের মধ্যে কোনো ছোঁয়াছুঁয়িই হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমরা বহুবারই শুনেছি যে এ-বিশ্বজগতের মধ্যে স্তর বা পংক্তি-ভাগ থাকলেও সে-ভাগ এমন নিরেট নয় যার ফলে এর সঙ্গে ওর সবরকম লেন-দেনেরই পথ বন্ধ। আমার এক ৺ইংরাজবন্ধু এ নিয়ে খুব তীক্ষ্ণভাবে ভাবতেন, মাথা ঘামাতেন। তাতে—১৯৩০ সালে—শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ পত্রে :

"If we regard the gradation of worlds or planes as a whole, we see them as a great, connected, complex movement : the higher precipitate their influences on the lower, the lower reacts to the higher and develop or manifest in themselves within their formula something that corresponds to the superior power and its action."*

কিন্তু তবু মনের ভাষায় বোঝাতে হ'লে ভাগ-করার আশ্রয় নিতেই হয়, কেন না—শ্রীঅরবিন্দের কাছেই শুনেছি বহুবার যে—মনের ধর্মই হ'ল খণ্ড খণ্ড ক'রে তবে বোঝা—এ-ভাবে এক এক ক'রে একে ওকে তাকে না বুঝলে তার কাছে সবই ঝাপসা থেকে যায় সে কাউকেই ধ'রেছুঁয়েও নাগাল পায় না যেন। যাহোক্ মোটামুটি ছকটা দাঁড়ায় এই ধরণের :

* এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা লোক বা জগত্‌কে যদি সমগ্রভাবে দেখি তাহ'লে দেখতে পাব যে এ হ'ল একটি সুসংবদ্ধ বিশ্বপ্রকাশ—জটিল, বহুমুখী। এখানে বড়র প্রভাব ফলল, দানা বাঁধল ছোটর মধ্যে, আবার ছোট সাড়া দিল বড়র ছোঁওয়ায় যাতে ক'রে তার স্বছন্দের স্বরাজের মধ্যে ছন্দায়িত হ'য়ে উঠল কিছু না কিছু বড়র শক্তি বা ক্রিয়া।

অতিমানস	...	Supermind
অধিমানস	...	Overmind
সম্বুদ্ধ মানস	...	Intuitive Mind
প্রদীপ্ত মানস	...	Illumined Mind
উত্তর মানস	...	Higher Mind
মানস	...	Mind

কিন্তু এদের মধ্যে একটু আধটু ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটলেও—এবং একথা সত্য হ'লেও যে "আমাদের মন নানাদিকেই নিজেকে ছাড়িয়ে যায়"* তবু—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—"আমাদের মন তার যুক্তিবিচার দিয়ে এদের সত্যিকার কোনো নাগালই পায় না। সে পারে বড় জোর একজন দর্শক বা কেরানির মতন এসব ঊর্ধ্ব-লোকের মতিগতির হিসেব রাখতে, আভাস-ইঙ্গিত টুকে নিতে।"†

কিন্তু তবু এটুকুও সে পারে মানস থেকে অধিমানস পর্যন্ত চৈতন্যলোকের এলাকায়—কেন না এই চৌহদ্দির মধ্যে এসব দৈবী চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে—নিজেকে জানান দিয়েছে—কমবেশি

* "...there are several directions in which human mind reaches beyond itself, tends towards self-exceeding." (THE LIFE DIVINE—Supermind, Mind and the Overmind Maya.........p. 417.)

† "...but at this stage the judgment of reason becomes quite inapplicable, it can only act as an observer or registrar understanding or recording the more luminous intimations, judgments and discriminations of the higher power." (Ibid. Vol. II—The Ascent Towards Supermind, p. 999.

প্রত্যক্ষ ভাবে—সোজাসুজি। কিন্তু অতিমানসের বেলায় এটুকুও ঘটেনি যেহেতু এযাবৎ এ-স্তরের সত্যের কোনো প্রত্যক্ষ প্রকাশ হয় নি আমাদের দেহমনপ্রাণলোকে—নিচের এই সব থাকগুলির মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যা একটু আধটু ছিটেফোঁটা এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয় এইজন্যে যে অতিমানস তার স্বধর্মে সক্রিয় হ'তে পারে না যদি না নিজের অনুকূল পরিবেশ পায়। এই পরিবেশ বিবর্তনে ইভল্যুশনে গ'ড়ে উঠছে বটে—এবং তারই নাম হ'ল বিশ্বপ্রকৃতির যোগলীলা এ-ও সত্য—কিন্তু হ'লে হবে কি, নিচেকার এই সব স্তরের সঙ্গে অতিমানস স্তরের একটা মস্ত প্রভেদ এইখানে যে অধিমানস থেকেই অজ্ঞানের অবিদ্যার গৌরচন্দ্রিকা শুরু হয়েছে, তার নিচের স্তরগুলিতে তো অজ্ঞানের যাকে বলে একেবারে পালা-গান। কিন্তু অতিমানসে একটুও ছোঁয়াচ লাগে নি অবিদ্যার, অজ্ঞানের সে ছায়াও মাড়ায় নি। কাজেই অজ্ঞানের এবং অর্ধজ্ঞানের রাজ্যে এই নিষ্কল অপাপবিদ্ধ চেতনার অবতরণ হ'লে সে-ভার এরা ধারণ করতে পারে না (পরমহংসদেবের উপমা—হাতি নামলে ডোবাটা পারবে কেন সাম্‌লাতে ?) কিন্তু তবু বিবর্তন তো চলছেই অক্লান্ত ছন্দে —সে থামবে কেমন ক'রে ? কাজেই ক্রমশ সময় আসছে যখন দেহ, প্রাণ, মানস, উত্তর মানস, প্রবুদ্ধ মানস, সম্বুদ্ধ মানস, অধিমানস সবাই হবে অতিমানস চৈতন্য-প্রবুদ্ধ, অর্থাৎ যখন অতিমানস সত্যের অবতরণ হবে এই সব নিম্নতর স্তরে। হবে কী জন্যে ? এই জন্যে যে প্রতি স্তরেই তার উর্ধ্বতর সত্যের বীজ

রয়েছে উপ্ত, আর বিবর্তনের উপরেই ভার—এই সব নিহিত বীজে মুকুল ফলিয়ে ক্রমশ ফুল ফলের ফসল ফলানোর। কাজেই অতিমানস সত্যের চাপ ক্রমশই বাড়ছে—বাড়তে বাধ্য—এই সব নিম্নতর স্তরে। ওদিকে এই সব নিম্নতর স্তরও সাড়া দিচ্ছে—চাইছে এই উর্ধ্বলোকের স্পন্দন—অবতরণ। কাজেই এখন সময় এসেছে, বলছেন শ্রীঅরবিন্দ, যখন নামবে এই অতিমানসের ঢল। কিন্তু বিচিত্র বিবর্তনের লীলাখেলা—বিশেষ ক'রে এই উর্ধ্বতর সত্যের নিম্নতর লোকে অবতরণের সন্ধিলগ্নে। উপরের চাপ ও নিচের ডাক এলেই হবে না, চারদিকের পরিবেশকেও অন্তত খানিকটা তৈরী হ'তে হবে তো—প্রকৃতির মধ্যে এতদিনকার অভ্যাসের ফলে একটা রক্ষণশীলতার বিমুখভাব গ'ড়ে উঠেছে তাকেও খানিকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে লওয়াতে হবে তো। আরো নানারকম বাধা আছে—নানা বিরুদ্ধ শক্তি, অন্ধকার অসত্যের বিদ্রোহ—কত কী—যার খবর যোগে মেলে। এই সব কারণেই উর্ধ্বতর শক্তির ক্রিয়া নিম্নতর লোকে সর্বদাই হ'লেও প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ হ'তে সবুর সইতেই হয়। যেমন ধরো বস্তুর মধ্যে প্রাণ নামে তখনই যখন বস্তু হ'য়ে ওঠে খানিকটা প্রাণধর্মী, প্রাণের মধ্যে মন নামে তখনই যখন প্রাণী হ'য়ে ওঠে খানিকটা মনোধর্মী। তেম্‌নি এর পরের বিবর্তনের বেলায়ও। ব্যাপারটা কি রকম জানো? সবাই জানেন মধ্যযুগে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মনে অনেকগুলি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্যাভাস এসেছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন তাঁর আশপাশের মিস্ত্রি ও কারিগররা তখনো

যন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে নি ব'লে সেসব অনুভবকে লিওনার্দো বস্তু-জগতে যান্ত্রিক রূপ দিতে পারেন নি—যেমন বিমান। আধ্যাত্মিক লীলার সম্বন্ধেও একথা খাটে অর্থাৎ আমাদের আধারকেও খানিকটা প্রস্তুত হ'তে হবে বৈকি। তাই আমাদের মনের নিম্নতর থাকগুলি ছেড়ে আমাদেরকে একটু উপর দিকে ধাওয়া করতেই হবে। কিছুই করব না ব'লে ব'সে থাকলে "ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"—আর কি। আধারকে শুদ্ধতর করতে হবে তো। কালোর পথ ছেড়ে আলোর পথে পা বাড়াতে হবে তো। মৃত্যু ছেড়ে অমৃতে উত্তীর্ণ হ'তে চাইতে হবে তো। যেটুকু আমাদের করণীয় সেটুকু না করলে ভগবানের করুণা আসবে কেন? পাল না খাটালে অনুকূল হাওয়াকে সহায় পাব কী ক'রে?

শ্রীঅরবিন্দ তাই তাঁর যোগে ডাক দিয়েছেন আমাদেরকে এই আত্মশুদ্ধির দিকেই। বলছেন যে উর্ধ্বতর শক্তি নামতে চায় বটে কিন্তু সে আমাদের ডাকেরও অপেক্ষা রাখে। তাই—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—ভাগবত জীবনের জন্যে চাই দু'টি জিনিষ: "a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme Grace from above that answers."* করুণা আমাদের আধারকে তৈরি করে বটে—কিন্তু মিথ্যার আবহে নয়—আলোকেরই পরিবেশে। তাই কিছুটা প্রস্তুতি না হ'লে যে পূর্ণযোগের বনেদ তৈরি হ'তে পারে না এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

* নিচের স্তরে তীব্র ও নির্বিচল অভীপ্সার ডাক এবং উপর থেকে পরম করুণার সাড়া (The Mother)।

কিন্তু তবু—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—অতিমানসের অবতরণ হ'লে যে নব-মানবজাতি গ'ড়ে উঠবে—কি না অতিমানব—সে মানুষেরই বেশ একটি ধোপদুরস্ত চোস্ত সংস্করণ নয়— এ ও তা কাটছাঁট ক'রে যার একটি বেশ জুৎসৈ ছাঁচ গ'ড়ে উঠল। হরিদাস বাবুর ভাষায়ই বলি :

"অতিমানব আর মহামানব এক কথা নয়। মহামানব তিনি যাঁহার মধ্যে মানবীয় বৃত্তিগুলির চরম উন্মেষ লাভ হইয়াছে। অতিমানব বলি তাঁহাকে যাঁহার সমস্ত সত্তা ভাগবত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, দিব্য সুষমায় মণ্ডিত, যাঁহার জাগ্রত চেতনায় ভগবানের অতিমানস শক্তি প্রতিষ্ঠিত। মহামানব হইলেন শ্রেষ্ঠ মানব : অতিমানব হইলেন মানবরূপী দেবতা। শ্রেষ্ঠ জড়ের সহিত উদ্ভিদের, শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদের সহিত পশুর, শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানুষের যেমন ধর্মগত বৈষম্য আছে, মহামানবের সহিত অতিমানবেরও সেইরূপ পার্থক্য।"

জানা কথা অবশ্য—কিন্তু তবু বিশেষ ক'রে অধ্যাত্মতত্ত্বের নানা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের হাজারো খুঁটিনাটির সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এমন সুন্দর ক'রে বলা সবাইয়ের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ এ শুধু জানার ব্যাপার নয়—জানানোর প্রশ্ন এখানে আরো জরুরি। পরমহংসদেবের কথা মনে নেই—নিজেকে মারতে হ'লে একটি নরুনই যথেষ্ট, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে চাই ঢাল তলোয়ার হাতি হাতিয়ার।

অবশ্য বইটি পড়তে পড়তে একথা মনে না হ'য়েই পারে না যে ব্যাখ্যা আয়তনে একটু অত্যধিক ছোট হ'য়ে পড়েছে। মানি, শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব তথা তথ্য বেশ

সুগ্রথিত ও সুপ্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তবু অধ্যাত্মতত্ত্বের যারা খাঁটি তাত্ত্বিক—উৎসাহী—তাঁদের কাছে এ-বইটি তৃষ্ণা যেন বাড়িয়েই দেয়—আরো জানবার, আরো বুঝবার, আরো শিখবার। বিশেষ ক'রে এযুগে—যখন সন্ধানী মানুষ ক্রমশই বুঝছে যে মানুষ খতিয়ে মানস জীব নয়—আধ্যাত্মিক জীবই বটে—আর "আধ্যাত্মিক মানুষকে সব আগে আবিষ্কার করতে হবে তার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-সত্তাকে, এবং আর পাঁচজনকে এই অন্তর্বিকাশের দিকে এগুবার সহায়তা করাই হ'ল তার অকৃত্রিম জীবসেবা, এ না হ'লে বাইরের সাহায্য আমাদের একটু আধটু কাজে আসতে পারে বটে কিন্তু তার বেশি না।"*

যোগ হ'ল এই আধ্যাত্মিক জীবনের সবচেয়ে সুসম্বদ্ধ, বহু-অভিজ্ঞতায় গ'ড়ে ওঠা সিঁড়ি। এই কথাটা আজ মানুষকে জানতে হবে, জানতে হবে যে যোগ আসলে কোনো রহস্যময় ধোঁয়াটে বুদ্ধি-পরিপন্থী পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: "In reality there is nothing intrinsically hidden or mystic about Yoga—" যোগ হচ্ছে "a certain knowledge about the power of the mind over the body and the

* "To discover the spiritual being in himself is the main business of the spiritual man and to help others towards the same evolution is his real service to the race; till that is done, an outward help can succour and alleviate, but nothing or very little more is possible" (Life Divine—The Evolution of the Spiritual Man).

inner spirit over the mind which are not generally realised and have hitherto been considered by those in the secret too momentous in their consequences for disclosure until men should be trained to use them aright." শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন কেন এ-শক্তিকে গুহ্য রাখার প্রয়োজন ছিল—যোগীরা জ্ঞানী ছিলেন ব'লেই বৈজ্ঞানিক ডিমক্রাসির পদ্ধতিতে যৌগিক বারুদ-ডিনামাইটের ফেরি করেন নি হাটে বাজারে। তাঁরা যে জানতেন—মানুষ যতদিন না নিরভিমান ও নির্বাসনা হবে ততদিন এসব শক্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা তাদের পক্ষে হবে আগুন নিয়ে খেলা। কিন্তু এখন ক্রমশ এমন সময় আসছে যখন যোগশক্তির আত্মপ্রকাশ হ'য়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী —যখন যোগের আলো নৈলে মানুষ তার বিবর্তনে এর পরের ধাপে উঠতে পারবে না :— "Yoga must now be revealed to mankind because without it mankind cannot take the next step in the human evolution."

কিন্তু যোগশক্তিকে এভাবে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লে চাই যথার্থ দিব্যজ্ঞান—ভাগবত আদেশ। সেই জ্ঞানের আলোয়ই শ্রীঅরবিন্দ পথনির্দেশ করেছেন, "আদেশ"-এর ইঙ্গিতপথেই উদ্‌ঘাটন করতে ব্রতী হয়েছেন যোগশক্তির গুহ্য তত্ত্ব—যদিও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই সাবধান ক'রে দিয়েছেন যোগার্থীকে যে যোগলব্ধ শক্তিকে কোনো ছোট আত্মসিদ্ধি স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে দেখলে সর্বনাশ অবধারিত। আর কী আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে যে তিনি পরীক্ষা ক'রে

দেখেছেন এ-শক্তির নানা লীলাখেলা সেটা তাঁর যোগকে একটু না চিনলে, তাঁর জ্ঞানকে একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ না করলে বুঝতে পারাও সম্ভব নয়। কত দিক থেকে যে তিনি দেখেছেন মানব-জীবনের মূল সমস্যাগুলি আর কী ভাবে যোগের আলোয় বিপথে পথ কেটে চলেছেন তার পরিচয়ই তো আমরা চাই হরিদাসবাবুর মতন জ্ঞানপিপাসু যোগার্থীর কাছে। তাঁর কাছে আমরা শুনতে চাই—শ্রীঅরবিন্দের যোগে কেন মামুলি যোগের মতন জপতপের কোনো নির্বিশেষ বিধান নেই—কী ভাবে প্রত্যেককে তার আন্তর নির্দেশে চ'লে চৈত্যপুরুষের (psychic being-এর) বিচিত্র বিকাশের স্বকীয় ধারাটি আবিষ্কার করতে হয়; শুনতে চাই পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের যথার্থ সম্বন্ধের কথা—কেমন ক'রে এ ওকে পূর্ণ করে; শুনতে চাই জ্ঞানের জ্ঞান বলতে কেন আত্মজ্ঞান, ভাগবত-জ্ঞানকেই বোঝায়। বস্তুত লৌকিক জ্ঞান আর পারমার্থিক জ্ঞান দুরকম জ্ঞান আছে ব'লে যে একটা জনশ্রুতি আছে সেটা ভিত্তিহীন। জ্ঞান দ্বিবিধ নয়, জ্ঞান হ'ল শাশ্বত, অদ্বিতীয়। যুগে যুগে সে-জ্ঞানের মধ্যে নব নব আলোক-বিভূতির সম্পদ আসে সত্য—কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান বলতে বোঝায় পারমার্থিক জ্ঞানই বটে, যেহেতু এ-জ্ঞান লাভ না হ'লে ব্যবহারিক জ্ঞান, লৌকিক বুদ্ধি, ঘরোয়া বিচক্ষণতা কিছুই কাজে আসে না, ধোপে টেঁকে না। তাই যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা সবাই বলেছেন যে যোগ ছাড়া কখনই পরমতত্ত্ব লাভ হ'তে পারে না। এই যোগের পদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসামান্য জীবনের অসামান্য সাধন-পটভূমিকায়

কী ভাবে গ'ড়ে তুলেছেন বহু দীক্ষার্থীর জীবনগ্রন্থি মোচন করবার সঙ্গে সঙ্গে—তার আরো গভীর পরিচয় আমরা চাই হরিদাস বাবুর কাছে: শুনতে চাই শ্রীঅরবিন্দের যোগে বুদ্ধির সঙ্গে শ্রদ্ধার সামঞ্জস্যের কথা, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের রাখীবন্ধনের প্রাণের কথা; শুনতে চাই বৈরাগ্য কাকে বলে, অনাসক্তিই বা কী জিনিষ, আর কেন বৈরাগ্যের চেয়ে অনাসক্তিই বস্তুলাভের পক্ষে বেশি অনুকূল; শুনতে চাই রোখালো অনৈহিকতা এমন কি কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েও মানুষ আত্মজয়ের তপস্যায় কী ভাবে কতখানি লাভ করেছে, আর লক্ষমুখী ঐহিকতার মধ্যে দিয়ে কী ভাবে লোভমোহ-জাতীয় রিপুর চোরাবালিতে ডুবেছে; শুনতে চাই ভক্তির কোন্ ছন্দটি অন্তর্মুখী—psychic—নিরাপদ, আর কোন্‌টি বহিরুচ্ছ্বাসী—vital—কাজেই বিঘ্নবহুল; শুনতে চাই তপস্যার আবশ্যিকতা কতদূর পর্যন্ত, আর করুণা কেমন ক'রে তাকে পূর্ণতা দেয়; শুনতে চাই আত্মসমর্পণের ঠিক ছন্দটি কী আর কেনই বা অলস নিশ্চেষ্টতা মানে বকল্‌মা দেওয়া নয়; শুনতে চাই শ্রদ্ধার অন্তর্দীপ্তির (faith) সঙ্গে মনগড়া বিশ্বাস ও গোঁড়ামির (belief এবং dogma) তফাৎ কোথায়; শুনতে চাই খাঁটি উপলব্ধিগম্য আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গতানুগতিক আচারসর্বস্বতা ওরফে মেকি ধর্মশীলতার পার্থক্য কোথায়; শুনতে চাই ধর্মের উচ্ছ্বাসতন্ত্রতার ফলে কেন আন্তর ধ্যানপ্রতিষ্ঠার শিখর থেকে সে স্খলিত হ'ল; শুনতে চাই কেন, কী কী অসহিষ্ণুতা ও লোকমুখাপেক্ষিতার ফলে, আনু-ষ্ঠানিক ধর্ম সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভ্রষ্টলক্ষ্য হ'য়েও কতখানি সহায় হয়েছিল

মানুষের অন্তর্জীবনের বিকাশপথে : শুনতে চাই কেন যান্ত্রিকতা ও শিক্ষার বহির্মুখী কৌশলে ও অসহিষ্ণুভাবে কেটে-ছেঁটে সবাইকেই এক ছাঁচে ঢালাই করবার, এক গোয়ালে মাথা মুড়ুবার চেষ্টায় মানুষের মুক্তি নেই ; শুনতে চাই কেন আধ্যাত্মিক সাধনা বিনা মানুষের চরম সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধানই হ'তে পারে না এবং কী কী কারণে কেন সব চরম নিষ্পত্তিরই চাবিকাঠি ঐ আধ্যাত্মিকতারই হাতে :—এক কথায় আমরা তাঁর কাছে শুনতে চাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ কেন মানুষের বিকাশে পূর্ণতার আলো ধরে তার বহুমুখী তৃষ্ণা মিটিয়ে—জ্ঞানের, কর্মের, ভক্তির, শিল্পের, সেবার, তপস্যার, ত্যাগের। একথা বলছি আরো এই জন্যে যে যদিও শ্রীঅরবিন্দের যোগের পূর্ণ রহস্যের দিশা পেতে আমরা তাঁরই শরণ নেব, বটেই তো—কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের মতন সাধারণ গড়পড়তা মানুষ কী ধরণের প্রত্যাশা রাখে ও সে-প্রত্যাশা মিটবার সর্ত কী কী—জানতে আমরা মনস্বী যোগার্থী সতীর্থের শরণ নিতে পারি বৈ কি—আরো, বাংলা ভাষার জারকে গুরুপাক তত্ত্বদের একটু জারিয়ে নিতে। "যোগার্থী" কথাটা বললাম কেন আশা করি বুঝবে? এই জন্যে যে শুধু জ্ঞানার্থী হ'লে শ্রীঅরবিন্দের যোগ বোঝা যায় না, যেতে পারে না—যেমন গণিতবিদ্যা না জানলে বোঝা যায় না বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্বগুলি। হরিদাস বাবুর মতন উজ্জ্বলবুদ্ধি মননশীল ব্যাখ্যাকারের কাছে তাই আমরা অনেক আশা রাখি—কেন না তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্য, আন্তরিকতা ও যোগারূঢ় বুদ্ধির দুর্লভ ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে—

যে-সমাবেশ বড় বড় বিদ্বান্‌, শাস্ত্রকোবিদ ও মহামহোপাধ্যায়ের মধ্যেও দুর্লভ।

একথা এত ক'রে বলছি আরো এই জন্যে যে এ-যুগে হাল আমলে ডিমক্রাসির এক অতি অসার সস্তামি আমাদেরকে পেয়ে বসেছে যার পরামর্শে তাল ঠুকে আমরা অনেকেই বলা শুরু করেছি যে গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যকেও যাচাই করবে মানুষ তার ডিমক্রাসির হাটের গড়পড়তা বুদ্ধির ফিতে নিয়ে—বিজ্ঞানের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে, আর এরই নাম না কি বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যমানবের স্বাধীন চিন্তা—নিরপেক্ষ বিচার! কিন্তু নামকরণে চুক হয়েছে: এরই নাম স্বাধিকারপ্রমত্ততা। কারণ জীবনের পরম জিজ্ঞাসায় আধ্যাত্মিকতার সত্যাসত্য যাচাই করতে হ'লে হ'তে হবে ঐ পথেরই পথিক—মানে ভগবানেরই অন্তরঙ্গ, সভ্যতার দেহরক্ষী না। হাল আমলে মানস বুদ্ধির প্রতিপত্তি হ'য়ে উঠেছে অত্যধিক। কিন্তু এতে আর শানাবে না। মানুষকে মানুষের মতন বাঁচতে হ'লে আজ হ'তেই হবে সেই শাশ্বত সত্যের অধিকারী—আর এ-অধিকারের প্রধান সর্ত হ'ল মনের উর্ধ্বতর লোকের কাছে আত্মসমর্পণ—কেন না এই-ই হ'ল আলোর সর্ত: "There must be a total and sincere surrender; there must be an exclusive self-opening to the divine Power; there must be a constant and integral choice of the Truth that is descending."*

* আমাদের করতেই হবে পরম ও চরম আত্মসমর্পণ; আমাদের নিজেদেরকে

এরই নাম হ'ল যোগ। শ্রীঅরবিন্দের যোগ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় কেন সত্যের সত্য হ'ল আধ্যাত্মিক সত্য, আর কোন্ সাধনায় সে-সত্যকে লাভ ক'রে মানুষ বিশ্বানুগ হ'য়েই বিশ্বাতিগকে পেতে পারে; প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রেই বিশ্বপ্রকৃতির পথনির্দেশ পেতে পারে; শান্তির ধ্রুব-পথেই জীবনের লক্ষ অপূর্ণতা অশান্তি হাহাকারের উপরে পৌছুতে পারে তাঁর আলোর স্বরাজ্যে—"যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্"——যেখানে বিশ্বের পরমরূপ শুভ্রতায় উজ্জ্বল। তাই এ অশ্রদ্ধা অজ্ঞান ও নাস্তিকতার যুগে, নিরীশ্বর ভোগের তৃপ্তিহীন দুর্ভোগের যুগে কাঞ্চনকে পদে পদে কাঁচের মূল্যে বিকোবার মূঢ়তার যুগে শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাযোগীর পূর্ণযোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টির কথা যতই শুনতে পাই ততই ভালো। কারণ শুধু এ-ই নয় যে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (ধর্মের ছিটেফোঁটাও মহৎভয় থেকে ত্রাণ করে) কারণ এই যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধের জগতে মনের ক্ষীণ বাতিতে আর পথ খুঁজে না পেয়ে, হাজারো প্রাণপ্রবৃত্তির আঁধার তুফানে দিশেহারা হ'য়ে হারাতে বসেছে জ্ঞানের এই ধ্রুবনির্দেশ, যে :—

"A perfected human world cannot be created by men or composed of men who are themselves

---

খুলে ধরতে হবে কেবল সেই দিব্যশক্তির কাছে; সব সময়ে এবং সব দিক দিয়ে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে শুধু সেই সত্যকে বা নামল ব'লে। (THE MOTHER)।

imperfect. Even if all our actions are scrupulously regulated by education or law or social or political machinery, what will be achieved is a regulated pattern of minds, a fabricated pattern of lives, a cultivated pattern of conduct; but a conformity of this kind cannot change, cannot re-create the man within, it cannot carve or cut out a perfect soul or a perfect thinking man or a perfect or growing living being. For soul and mind and life are powers of being and can grow but cannot be cut out or made; an outer process or formation can assist or can express soul and mind and life but cannot create or develop it... This is the first truth that our creative zeal and aspiration have to learn, otherwise all our human endeavour is foredoomed to turn in a futile circle and can end only in a success that is a specious failure." (The Life Divine...p. 1112)

"যে-সব মানুষ নিজেরাই অসম্পূর্ণ তাদের মিলিত চেষ্টায় কোনো সুসম্পূর্ণ মানবজগৎ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব। শিক্ষা কি নীতি কি সমাজতন্ত্র কি রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে যদি আমাদের প্রতিটি কাজও নিখুঁৎভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহ'লেও গ'ড়ে উঠবে বড় জোর একই ধাঁচের সার সার মন, একই ধাঁচের অতিনির্দিষ্ট জীবনধারা, একই

ধাঁচের সংস্কৃত আচার। কিন্তু এ-ধরণের গতানুগতিকতায় না পারে ভিতরের মানুষটির কোন রূপান্তর হ'তে, না পারে তার মধ্যে কোনো নব সৃষ্টি জেগে উঠতে, না পারে কোনো নিখুঁৎ মহাপুরুষ কি চিন্তানায়ক কি বিকাশশীল জীবন্ত মানুষ গ'ড়ে উঠতে। কারণ আমাদের অন্তরাত্মা, মন প্রাণ—সবই আমাদের সত্তার বিভিন্ন শক্তির মূর্ত বিগ্রহ: এরা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করতে পারে কিন্তু পারে না কাটছাঁট ক'রে মাপসৈ ফর্মাশি ঢঙে নির্মিত হ'তে। বাইরের বিধিব্যবস্থা এদেরকে গ'ড়ে তোলার পথে সহায় হ'তে পারে, কিন্তু পারে না সৃষ্টি করতে কি পুষ্টিসাধন করতে।...আমাদের সৃজনী উৎসাহ ও অভীপ্সা নিয়ে শুধু তো ছুটলেই হবে না—সব আগে চাই এ-সত্যটি বোঝা, নৈলে আমাদের সব মানবিক চেষ্টাই ঘুরে মরবে এক ব্যর্থবৃত্তে—খতিয়ে লাভ হবে শুধু এমন এক সাফল্য যা নৈষ্ফল্যেরই নামান্তর।"